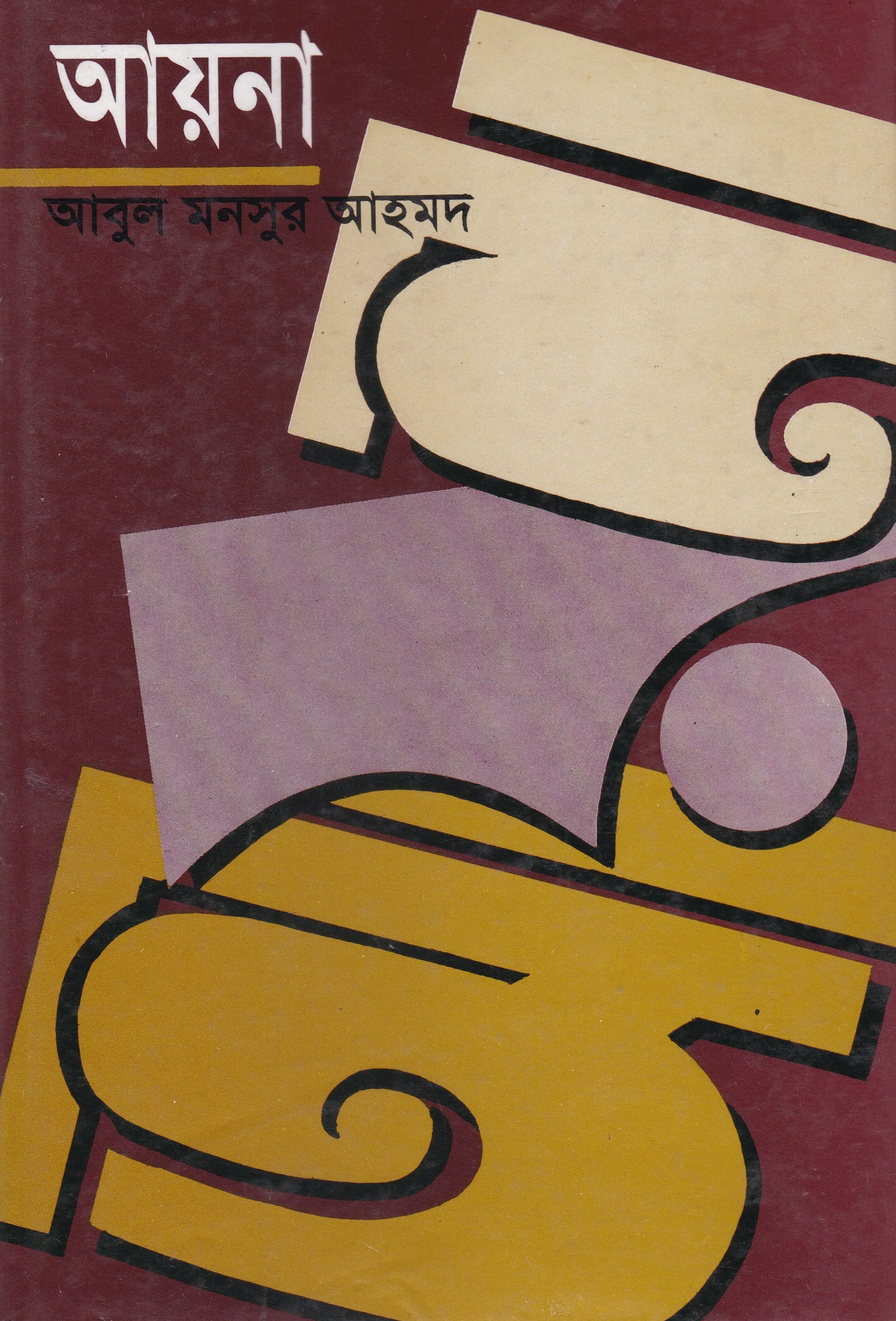
# আয়না

আবুল মনসুর আহমদ



# আয়না




আবুল মনসুর আহমদ



আহমদ পাবলিশিং হাউস

প্রকাশক | মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

চতুর্দশ মুদ্রণ | এপ্রিল ২০০৫
বৈশাখ ১৪১২

প্রচ্ছদ | সরদার জয়নুল আবেদীন

বর্ণ বিন্যাস | উর্মি কম্পিউটার্স
৪৭/১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ | নিউ সোসাইটি প্রেস
৪৬ জিন্দাবাহার ১ম লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য | **ষাট টাকা মাত্র**

**AYNA**—Written by Abul Mansur Ahmed, Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100, 14th Print : April 2005
**Price : Tk. 60.00 Only.**

ISBN 984-11-0359-6

## সূচি

## আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

আত্মকথা

বেশীদামে কেনা কমদামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা

শেরেবাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশের কালচার

সত্যমিথ্যা

আবেহায়াত

ফুড কনফারেন্স

আসমানী পর্দা

গালিভরের সফরনামা

আল-কোরআনের নসিহৎ

# হুজুর কেবলা

এমদাদ তার সবগুলি বিলাতি ফিনফিনে ধূতি, সিল্কের জামা পোড়াইয়া ফেলিল; ফ্লেক্সের ব্রাউন রঙের পাম্প্‌শুগুলি বাবুর্চিখানার বঁটি দিয়া কোপাইয়া ইলশা-কাটা করিল। চশ্‌মা ও রিস্টওয়াচমাটিতে আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল; ক্ষুর স্ট্রপ, শেভিংস্টিক ও ব্রাশ অনেকখানি রাস্তা হাঁটিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়া আসিল; বিলাসিতার মস্তকে কঠোর পদাঘাত করিয়া পাথর বসানো সোনার আংটিটা এক অন্ধ ভিক্ষুককে দান করিয়া এবং টুথক্রীম ও টুথব্রাশ্‌ পায়খানার টবের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া দাঁত ঘষিতে লাগিল।

অর্থাৎ এমদাদ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিল! সে কলেজ ছাড়িয়া দিল।

তারপর সে কোরা খদ্দরের কল্লিদার কোর্তা ও সাদা লুঙ্গি পরিয়া মুখে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ ঝাঁকড়া দাড়ি লইয়া সামনে-পিছনে সমান-করিয়া-চুল-কাটা মাথায় গোল নেকড়ার মতো টুপি কান পর্যন্ত পরিয়া চটিজুতা পায়ে দিয়া যেদিন বাড়িমুখে রওনা হইল, সেদিন রাস্তার বহুলোক তাকে সালাম দিল।

সে মনে মনে বুঝিল, কলিযুগেও দুনিয়ায় ধর্ম আছে।

কলেজে এমদাদের দর্শনে অনার্স ছিল।

কাজেই সে ধর্ম, খোদা, রসূল কিছুই মানিত না। সে খোদার আরশ, ফেরেশ্‌তা, ওহী, হযরতের মেরাজ লইয়া সর্বদা হাসি ঠাট্টা করিত।

কলেজ ম্যাগাজিনে সে মিল, হিউম, স্পেন্সার, কোমতের ভাব চুরি করিয়া অনেকবার খোদার অস্তিত্বের অসারতা প্রমাণ করিয়াছিল।

কিন্তু খেলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করিয়া এমদাদ একেবারে বদলাইয়া গেল।

সে ভয়ানক নামাজ পড়িতে লাগিল। বিশেষ করিয়া নফল নামাজ সে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িল।

গোল-গাল করিয়া বাঁশের কঞ্চি কাটিয়া সে নিজ হাতে একছড়া তস্‌বিহ্‌ তৈরি করল। সেই তস্‌বির উপর দিয়া অষ্টপ্রহর অঙ্গুলি চালনা করিয়া সে দুইটা আঙ্গুলের মাথা ছিঁড়িয়া ফেলিল।

কিন্তু এমদাদ টলিল না। সে নিজের নশ্বর দেহের দিকে চাহিয়া বলিল ঃ হে দেহ, তুমি আমার আত্মাকে ছোট করিয়া নিজেই বড় হইতে চাহিয়াছিলে! কিন্তু আর নয়।

সে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে তসবিহ্‌ চালাইতে লাগিল।

# দুই

দিন যাইতে লাগিল।

ক্রমে এমদাদ একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

বহু চেষ্টা করিয়াও সে এবাদতে তেমন নিষ্ঠা আনিতে পারিতেছিল না। নিজেকে বহু শাসাইল, বহু প্রক্রিয়া অবলম্বন করিল; কিন্তু তথাপি পোড়া ঘুম তাকে তাহাজ্জতের নামাজ তরক্ করিতে বাধ্য করিতে লাগিল।

অগত্যা সে নামাজে বসিয়া খোদার নিকট হাত তুলিয়া কাঁদিবার বহু চেষ্টা করিল। চোখের পানির অপেক্ষায় আগে হইতে কান্নার মতো মুখ বিকৃত করিয়া রাখিল। কিন্তু পোড়া চোখের পানি কোন মতেই আসিল না।

সে স্থানীয় কংগ্রেস ও খেলাফৎ কমিটির সেক্রেটারি ছিল।

সেখানে প্রত্যহ সকাল-বিকালে চারিপাশের বহু মওলানা মওলবী সমবেত হইয়া কাবুলের আমিরের ভারত আক্রমণের কতদিন বাকি আছে তার হিসাব করিতেন এবং খেলাফৎ নোট-বিক্রয় লব্ধ পয়সায় প্রত্যহ পান ও জর্দা এবং সময়-সময় নাশ্তা খাইতেন।

ইহাদের একজনের সুফী বলিয়া খ্যাতি ছিল। তিনি এক পীর সাহেবের স্থানীয় খলিফা ছিলেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত 'এলহু' এলতু করিতেন।

অল্পদিন পূর্বে 'এস্তেখারা' করিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন যে, চারি বৎসরের মধ্যে কাবুলের আমির হিন্দুস্থান দখল করিবেন।

তাঁহার কথায় সকলেই বিশ্বাস করিয়াছিলো; কারণ মেয়েলোকের উপর জিনের আসর হইলে তিনি জিন ছাড়াইতে পারিতেন।

এই সূফী সাহেবের নিকট এমদাদ তার প্রাণের বেদনা জানাইল।

সুফী সাহেব দাড়িতে হাত বুলাইয়া মৃদু হাসিয়া ইংরাজী-শিক্ষিতদের উদ্দেশ্য করিয়া অনেক বাঁকা-বাঁকা কথা বলিয়া উপসংহারে বলিলেন ঃ হকিকতান যদি আপনি রুহের তরক্কী হাসেল করিতে চান, তবে আপনাকে আমার কথা রাখিতে হইবে। আচ্ছা; মাষ্টার সাহেব, আপনি কার মুরিদ?

এমদাদ অপ্রতিভভাবে বলিল ঃ আমি ত কারো মুরিদ হই নাই।

সুফী সাহেব যেন রোগ নির্ণয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন এইভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন ঃ হ-ম্, তাই বলুন। গোড়াতেই গলৎ। পীর না ধরিয়া কি কেহ রুহানিয়ৎ হাসেল করিতে পারে? হাদীস শরীফে আসিয়াছে ঃ [এইখানে সুফী সাহেব বিশুদ্ধরূপে আইন-গাইনের উচ্চারণ করিয়া কিছু আরবী আবৃত্তি করিলেন এবং উর্দুতে তার মানে-মতলব বয়ান করিয়া অবশেষে বাংলায় বলিলেন] ঃ জয্বা ও সলুক খতম করিয়া ফানা ও বাকা লাভে সমর্থ হইয়াছেন এরূপ কামেল ও মোকাম্মেল, সালেক ও মজ্যুব পীরের দামন না ধরিয়া কেহ জমিরের রওশনী ও রুহের তরক্কী হাসেল করিতে পারে না।

হাদীসের এই সুস্পষ্ট নির্দেশের কথা শুনিয়া এমদাদ নিতান্ত ঘাবড়াইয়া গেল।

সে ধরা-গলায় বলিল ঃ কি হইবে আমার তাহা হইলে সুফী সাহেব?

সুফী সাহেব এমদাদের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন ঃ ঘাবড়াইবার কোন কারণ নাই। কামেল পীরের কাছে গেলে একদিনে তিনি সব ঠিক করিয়া দিবেন।

স্বস্তিতে এমদাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সে আগ্রহাতিশয্যে সুফী সাহেবের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল ঃ কোথায় পাইব কামেল পীর? আপনার সন্ধানে আছে?

উত্তরে সুফী সাহেব সুর করিয়া একটি ফারসী বয়েত আবৃত্তি করিয়া তার অর্থ বলিলেন ঃ জওহরের তালাসে যারা জীবন কাটাইয়াছে, তারা ব্যতীত আর কে জওহরের খবর দিতে পারে? হাজার শোকর খোদার দরগায়, বহু তালাশের পর তিনি জওহর মিলাইয়াছেন।

সুফী সাহেবের হাত তখনও এমদাদের মুঠার মধ্যে ছিল। সে তা আরো জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল ঃ আমাকে লইয়া যাইবেন না সেখানে?

সুফী সাহেব বলিলেন ঃ কেন লইয়া যাইব না? হাদিস শরীফে আসিয়াছে ঃ (আরবী ও উর্দু) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় আসিতে চায়, তার সাহায্য কর।

সংসারে একমাত্র বন্ধন এবং অভিভাবক বৃদ্ধা ফুফুকে কাঁদাইয়া একদিন এমদাদ সুফী সাহেবের সঙ্গে পীর-জিয়ারতে বাহির হইয়া পড়িল।

## তিন

এমদাদ দেখিল ঃ পীর সাহেবের একতলা পাকা বাড়ি। বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। অন্দরবাড়ির সব ক'খানা ঘর পাকা হইলেও বৈঠকখানাটি অতি পরিপাটি প্রকাণ্ড খড়ের আটচালা।

সে সুফী সাহেবের পিছনে পিছনে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। দেখিল ঃ ঘরে বহু লোক জানু পাতিয়া বসিয়া আছেন। বৈঠকখানার মাঝখানে দেওয়াল ঘেঁষিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসনে মেহেদী-রঞ্জিত দাড়ি বিশিষ্ট একজন বৃদ্ধ লোক তাকিয়া হেলান দিয়া আলবোলায় তামাক টানিতেছেন।

এমদাদ বুঝিল ঃ ইনিই পীর সাহেব।

'আসসালামু আলায়াইকুম' বলিয়া সুফী সাহেব সোজা পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া হাঁটু পাতিয়া বসিলেন। পীর সাহেব সম্মুখস্থ তাকিয়ার উপর একটি পা তুলিয়া দিলেন। সুফী সাহেব সেই পায়ে হাত ঘঁষিয়া নিজের চোখে মুখ ও বুকে লাগাইলেন।

তৎপর পীর সাহেব তাঁর হাত বাড়াইয়া দিলেন। সুফী সাহেব তা চুম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং পিছাইয়া-পিছাইয়া কিছু দূর গিয়া অন্যান্য সকলের ন্যায় জানু পাতিয়া বসিলেন।

পীর সাহেব এতক্ষণে কথা বলিলেন ঃ কিরে বেটা, খবর কি? তুই কি এরই মধ্যে দায়েরায়ে হকিকতে মহব্বত ও জয্‌বায়েযাতী-বনাম হোব্বে এশ্‌ক হাসেল করিয়া ফেললি নাকি?

পীর সাহেবের এই ঠাট্টায় লজ্জা পাইয়া সুফী সাহেব মাথা নিচু করিয়া মাজা ঈষৎ উঁচু করিয়া বলিলেন; হযরত, বান্দাকে লজ্জা দিতেছেন!

পীর সাহেব তেমনি হাসিয়া বলিলেন ঃ তা না হইলে নিজের চিন্তা ছাড়িয়া অপরের রুহের সুপারিশ করিতে আমার নিকট আসিলেন কেন? কই তোর সঙ্গী কোথায়? আহা! বেচারা বড়ই অশান্তিতে দিনপাত করিতেছে।

এই বলিয়া পীর সাহেব চক্ষু বুজিলেন এবং প্রায় এক মিনিট কাল ধ্যানস্থ থাকিয়া চক্ষু মেলিয়া বলিলেন ঃ সে এই ঘরেই হাজির আছে দেখিতেছি।

উপস্থিত মুরিদগণের সকলে বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। এমদাদ ভক্তি ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে পীর সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মেহেদী-রঞ্জিত দাড়ি গোঁফের ভিতর দিয়া পীর সাহেবের মুখ হইতে এক প্রকার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

সুফী সাহেব এমদাদকে আগাইয়া আসিতে ইশারা করিলেন। সে ধীরে ধীরে পীর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সুফী সাহেবের ইঙ্গিতে অনভ্যস্ত হাতে কদম-বুসি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পীর সাহেব "বস বেটা, তোর ভাল হইবে। আহা, বড় গরীব!" বলিয়া আলবেলার নলে দম কষিলেন।

সুফী সাহেব আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন ঃ হযরত এর অবস্থা তত গরীব নয়। বেশ ভাল তালুক সম্পত্তি-

পীর সাহেব নলে খুব লম্বা টান কষিয়াছিলেন; কিন্তু মধ্যপথে দম ছাড়িয়া দিয়া মুখে ধোঁয়া লইয়াই বলিলেন ঃ বেটা, তোরা আজিও দুনিয়ার ধন-দওলত দিয়া ধনী-গরীব বিচার করিস। এটা তোদের বুঝিবার ভুল। আমি গরীব কথায় দুনিয়াবী গোরবৎ বুঝাই নাই। মুসলমানদের জন্য দুনিয়ার ধন-দওলত হারাম। এই ধন-দওলত এন্‌সানের রুহানিয়ত হাসেলে বাধা জন্মায়, তার মধ্যে নফসানিয়ত পয়দা করে। আল্লাহতালা বলিয়াছেন ঃ (আরবী ও উর্দু) বেশক দুনিয়ার ধন-দওলত শয়তানের ওয়াস-ওয়াসা, ইহা হইতে দূরে পলায়ন কর। কিন্তু দুনিয়ার মায়া কাটান কি সহজ কথা? তোদের আমি দোষ দিই না। তোদের অনেকেই এখন যেকেরের দরজাতেই পড়িয়া আছিস। যে করে জলী ও যেকরে খফী- এই দুই দরজার যেকের সারিয়া পরে ফেকেরের দরজায় পৌঁছিতে হয়। ফেকের হইতে যহুর এবং যহুর হইতে মোরাকেবা-মোশাহেদার কাবেলিয়ত হাসেল হয়। খোদার ফজলে আমি আরেফিন, সালেহীন ও সিদ্দিকিনের মোকামাতের বিভিন্ন দায়েরার ভিতর দিয়া যেভাবে এলমে-লাদুন্নির ফলেজ হাসেল করিয়াছি, তোদের কলব অতটা কুশাদা হইতে অনেক দেরি-অনেক-

—বলিয়া তিনি হুক্কার নলটা ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং চোখ বুঁজিয়া ধ্যানস্থ হইলেন।

কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং চিৎকার করিয়া বলিলেন ঃ কুদরতে-ইয়্দানী, কুদরতে-ইয়্দানী।মুরিদরা সব সে-চিৎকারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না।

পীর সাহেব চিৎকার করিয়াই আবার চোখ বুজিয়াছিলেন। তিনি এবার ঈষৎ হাসিয়া চোখ মেলিয়া বলিলেন ঃ আমরা কত বৎসর হইল এখানে বসিয়া আছি?

জনৈক মুরিদ বলিলেন ঃ হযরত, বৎসর কোথায়? এই না কয়েক ঘন্টা হইল।

পীর সাহেব হাসিলেন। বলিলেন ঃ অনেক দেরি- অনেক দেরি। আহা বেচারারা চোখের বাহিরে আর কিছুই দেখিতে পায় না।

অপর মুরিদ বলিলেন ঃ হুজুর কেবলা, আপনার কথা মোটেই বুঝিতে পারিলাম না।

পীর সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন ঃ অত সহজে কি আর সব কথা বুঝা যায় রে বেটা? চেষ্টা কর্, চেষ্টা কর্।

মুরিদটি ছিলেন একটু আবদেরে রকমের। তিনি বায়না ধরিলেন ঃ না কেবলা,আমাদিগকে বলিতেই হইবে। কেন আপনি বৎসরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন?

পীর সাহেব বলিলেন ঃ ও-কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিস না। তার চেয়ে অন্য কথা শোন্। এই যে সাদুল্লাহ (সুফী সাহেবের নাম) একটি ছেলেকে আমার নিকট মুরিদ করিতে লইয়া আসিল, আমি সে-কথা কি করিয়া জানিতে পারিলাম? আজ তোমরা তাজ্জব হইতেছ। কিন্তু ইন্‌শাআল্লাহ, যখন তোমরা মোরাকেবায়ে-নেসবতে বায়নান্নাসে তালিম লইবে, তখন অপরের নেসবত সম্বন্ধে তোমাদের কলব আয়নার মতো রওশন হইয়া যাইবে। আল্‌গরয ইহাও খোদার এক শানে-আযিম। সাদুল্লাহ যখন আমার দস্ত-বুসি করে, তখন তার মুখের দিকে আমার নজর পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার রুহ্ সাদুল্লাহ্‌র রুহের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ হইয়া গেল। সেখানে আমি দেখিলাম, সাদুল্লাহ্‌র রুহ্ আর একটা নূতন রুহের সঙ্গে আলাপ করিতেছে। উহাতেই আমি সব বুঝিয়া লইলাম। আল্লাহু আযিমুশ্‌শান্।

বলিয়া পীর সাহেব একজন মুরিদকে হুক্কার দিকে ইঙ্গিত করিলেন।

মুরিদ হুক্কার মাথা হইতে চিলিম লইয়া তামাক সাজিতে বাহির হইয়া গেল।

পীর সাহেব বলিলেন ঃ তোমরা আমার নিজের নুৎফার ছেলের মতো। তথাপি তোদের নিকট হইতে আমাকে অনেক গায়েবের কথা গোপন রাখিতে হয়। কারণ তোমরা সে-সমস্ত বাতেনী কথা বরদাশ্‌ত করিতে পারিবে না। যেকের ও ফেকের দ্বারা কলব কুশাদা করিবার আগেই কোনও বড় রকমের নূরে তজল্লী তাতে ঢালিয়া দিলে তাতে কলব অনেক সময় ফাটিয়া যায়। এল্‌মে-লাদুন্নি হাসেল করিবার আগেই আমি একবার লওহে-মাওফুযে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন আমি মাত্র দায়েরায়ে-হকিকতে-লাতা আইউনে তালিম লইতেছিলাম। সায়েরে-নাযাবীর ফয়েজ তখনও আমার হাসেল হয় নাই। কাজেই আরশে-মওয়াল্লার পরদা আমার চোখের সামনে হইতে উঠিয়া যাইতেই আমি নূরে-ইয়্‌দানী দেখিয়া বেহুশ হইয়া পড়িলাম। তারপর আমার জেসমের মধ্যে আমার রুহের সন্ধান না পাইয়া আমার মুর্শেদ-কেবলা-তোরা তো জানিস আমার ওয়ালেদ সাহেবই আমার মুর্শেদ লওহে মাহফুজ হইতে আমার রুহ্ আনিয়া আমার জেস্‌মের মধ্যে ভরিয়া দেন, এবং নিজের দায়রার বাহিরে যাওয়ার জন্য আমাকে বহুৎ তম্বিহু করেন।

কাজেই দেখিতেছিস, কাবেলিয়ত হাসেল না করিয়া কোনও কাজে হাত দিতে নাই। খানিকক্ষণ আগে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ঃ আমরা কত বৎসর যাবৎ এখানে বসিয়া আছি? শুনিয়া তোরা অবাক হইয়াছিলি। কিন্তু এর মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তা শুনিলে তো আরো তাজ্জব হইয়া যাইবি। সে জন্যই সে কথা-বলিতে চাই নাই। কিন্তু কিছু কিছু না বলিলে তোরা শিখবি কোথা হইতে? তাই সে কথা বলাই উচিত মনে করিতেছি। সাদুল্লাহ এখানে আসিবার পর আমি আমার রুহকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। সে তামাম দুনিয়া ঘুরিয়া সাত হাজার বৎসর কাটাইয়া তারপর আমার জেসমে পুনরায় প্রবেশ করিয়াছে। এই সাত হাজার বৎসরে কত বাদশাহ ওফাত করিয়াছে, কত সুলতানাৎ মেস্‌মার হইয়াছে, কত লড়াই হইয়াছে; সব আমার সাফ-সাফ মনে আছে। সেরেফ এইটুকুই বলিলাম; ইহার বেশি শুনিলে তোদের কলব ফাটিয়া যাইবে।

ইতিমধ্যে তামাক আসিয়াছিল।

পীর সাহেব নল হাতে লইয়া ধীরে ধীরে টানিতে লাগিলেন।

সভা নিস্তব্ধ রহিল। কলব ফাটিয়া যাইবার ভয়ে কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

এমদাদ পীর সাহেবের কথা কান পাতিয়া শুনিতেছিল। কৌতূহল ও বিস্ময়ে সে অস্থিরতা বোধ করিতে লাগিল।

সে স্থির করিল, ইহার কাছে মুরিদ হইবে।

## চার

পীর সাহেব অনেক নিষেধ করিলেন। বলিলেন ঃ বাবা, সংসার ছাড়িয়া থাকিতে পারবে না, তাসাউওয়াফ বড় কঠিন জিনিস ইত্যাদি।

কিন্তু এমদাদ তাওয়াজ্জোহ লইল।

পীর সাহেব নিজের লতিফায় যেকের জারি করিয়া সেই যেকের এমদাদের লতিফায় নিক্ষেপ করিলেন।

এমদাদ প্রথম লতিফা জেক্‌রে-জলী আরম্ভ করিল।

সে দিবানিশি দুই চোখ বুজিয়া পীর সাহেবের নির্দেশমত 'এল্‌হু এল্‌হু' করিতে লাগিল।

পীর সাহেব বলিয়াছিলেন ঃ খেলওয়াৎ-দর-অঞ্জুমান দ্বারা নিজের কলবকে স্বীয় লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জাহ করিতে পারিলে তার কলবে যাতে আহাদিগয়াতের ফয়েজ হাসেল হইবে এবং তার রুহ ঘড়ির কাঁটার ন্যায় কাঁপিতে থাকিবে।

কিন্তু এমদাদ অনেক চেষ্টা করিয়াও তার কলবকে লতিফায় মুতাওয়াজ্জাহ করিতে পারিল না। তৎপরিবর্তে তার চোখের সামনে পীর সাহেবের মেহেদী-রঞ্জিত দাঁড়ি ও তাঁর রূপা-বাঁধানো গড়গড়ার ছবি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

ফলে তার কলবে যাতে-আহাদিগয়তের ফয়েজ হাসেল হইয়া তার রুহ্‌কে ঘড়ির কাটার মতো কাঁপাইবার পরিবর্তে ফুফু-আম্মার স্মৃতি বাড়ি যাইবার জন্য তার মনকে উচাটন করিয়া তুলিতে লাগিল।

দিন যাইতে লাগিল।

অনাহারে অনিদ্রায় এমদাদের চোখ দু'টি মস্তকের মধ্যে প্রবেশ করিল। তার শরীর নিতান্ত দুর্বল ও মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল।

সে বুঝিল, এইভাবে আরও কিছুদিন গেলে তার রুহ্ বস্তুতই জেস্ম হইতে আযাদ হইয়া আল্মে-আমরে চলিয়া যাইবে।

সে স্থির করিল ঃ পীর সাহেবের কাছে নিজের অক্ষমতার কথা নিবেদন করিয়া সে একদিন বিদায় হইবে।

কিন্তু বলি বলি করিয়াও কথাটা বলিতে পারিল না।

একটা নূতন ঘটনায় সে বিদায়ের কথাটা আপাতত চাপিয়া গেল! দূরবর্তী একস্থানে মুরিদগণ পীর সাহেবকে দাওয়াত করিল।

প্রকাণ্ড বজরায় একমণ ঘি, আড়াইমণ তেল, দশমণ সরু চাউল, তিনশত মুরগী, সাতসের অম্বুরি তামাক এবং তেরজন শাগরেদ লইয়া পীর সাহেব 'মুরিদানে' রওয়ানা হইলেন।

পীর সাহেবের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইংরাজিতে লিখিয়া কলিকাতায় সংবাদপত্রে পাঠাইবার জন্য এমদাদকেও সঙ্গে লওয়া হইল। নদীর সৌন্দর্য, নদীপারের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এমদাদের কাছে বেশ লাগিল।

পীর সাহেব গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলেন।

তিনি মুরীদগণের নিকট যে অভ্যর্থনা পাইলেন, তাহা দেখিলে অনেক রাজা-বাদশাহ রাজত্ব ছাড়িয়া মোরাকেবা-মোশাহেদায় বসিতেন।

পীর সাহেব গ্রামের মোড়লের বাড়িতে আস্তানা করিলেন।

বিভিন্ন দিন বিভিন্ন মুরিদের বাড়িতে বিরাট ভোজ চলিতে লাগিল।

পীর সাহেবের একটু দূরে বসিয়া গুরুভোজন করিয়া এমদাদ এত দিনের কৃচ্ছ সাধনার প্রতিশোধ লইতে লাগিল। ইহাতে প্রথম-প্রথম তার একটু পেটে পীড়া দেখা দিলেও শীঘ্রই সে সামলাইয়া উঠিল এবং তার শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও চেহারা বেশ চিকনাই হইয়া উঠিতে লাগিল।

পীর সাহেবের ভাত ভাঙিবার কসরত দেখার সুযোগ ইতিপূর্বে এমদাদের হয় নাই। এইবার সে ভাগ্যলাভ করিয়া এমদাদ বুঝিল ঃ পীর সাহেবের রুহানীশক্তি যত বেশিই থাকুকনা কেন, তাঁর হজমশক্তি নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশি।

সন্ধ্যায় পুরুষদের জন্য মজলিশ বসিত।

রাতে এশার নামাজের পর অন্দর মহলে মেয়েদের জন্য ওয়াজ হইত। কারণ অন্য সময় মেয়েদের কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়।

সেখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ ছিল।

স্ত্রীলোকদিগকে ধর্মকথা বুঝাইতে একটু দেরী হইত। কারণ মেয়েলোকের বুদ্ধিসুদ্ধি বড় কম-তারা নাকেস-আকেল।

কিন্তু বাড়িওয়ালার ছেলে রজবের সুন্দরী স্ত্রী কলিমন সম্বন্ধে পীর সাহেবের ধারণা ছিল অন্যরকম। মেয়ে-মজলিশে ওয়াজ করিবার সময় তিনি ইহারই দিকে ঘন-ঘন দৃষ্টিপাত করিতেন।

তিনি অনেক সময় বলিতেন ঃ তাসাউওয়াফের বাতেনী কথা বুঝিবার ক্ষমতা এই মেয়েটার মধ্যেই কিছু আছে। ভাল করিয়া তওয়াজ্জোহ দিলে তাকে আবেদা রাবেয়ার দরজায় পৌঁছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এশার নামাজের পর দাঁড়িয়ে চিরুণী ও কাপড়ে আতর লাগান সুন্নত এবং পীর সাহেব সুন্নতের একজন বড় মো'তেকাদ ছিলেন।

ওয়াজ করিবার সময় পীর সাহেবের প্রায়ই জয্‌বা আসিত।

সে জয্‌বাকে মুরিদগণ 'ফানাফিল্লাহ' বলিত।

এই ফানাফিল্লাহ্‌র সময় পীর সাহেব 'জ্বলিয়া গেলাম' 'পুড়িয়া গেলাম' বলিয়া চিৎকার করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িতেন। এই সময় পীর সাহেবের রুহ আলমে-খাল্‌ক্‌ হইতে আলমে-আমরে পৌঁছিয়া রুহে ইয়াদানির সঙ্গে ফানা হইয়া যাইত এবং নূরে ইয়াদানি তাঁর চোখের উপর আসিয়া পড়িত। কিন্তু সে নূরের জলওয়া পীর সাহেবের চক্ষে সহ্য হইত না বলিয়া তিনি এইরূপ চিৎকার করিতেন।

তাই জয্‌বার সময় একখণ্ড কাল মখমল দিয়া পীর সাহেবের চোখ-মুখ ঢাকিয়া দিয়া তাঁর হাত-পা টিপিয়া দিবার ওসিয়ত ছিল।

এইরূপ জয্‌বা পীর সাহেবের প্রায়ই হইত।

-এবং মেয়েদের সামনে ওয়াজ করিবার সময়েই একটু বেশি হইত।

এই সব ব্যাপারে এমদাদের মনে একটু খট্‌কার সৃষ্টি হইল।

কিন্তু সে জোর করিয়া মনকে ভক্তিমান রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সে চেষ্টায় সফল হইবার আগেই কিন্তু ও-পথে বাধা পড়িল। প্রধান খলিফা সুফী বদরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে পীর সাহেবকে প্রায়ই কানাকানি করিতে দেখিয়া এমদাদের মনের খট্‌কা বাড়িয়া গেল। তার মনে পীর সাহেবের প্রতি একটা দুর্নিবার সন্দেহের ছায়াপাত হইল।

এমন সময় পীর সাহেব অত্যন্ত অকস্মাৎ একদিন ঘোষণা করিলেন ঃ তিনি আর দু'এক দিনের বেশি সে অঞ্চলে তশরিফ রাখিবেন না।

এই গভীর শোক সংবাদে শাগরেদ-মুরিদগণের সকলেই নিতান্ত গম্‌গিন হইয়া পড়িল।

জনৈক শাগরেদ সুফী সাহেবের ইশারায় বলিলেন ঃ হুজুর কেবলা আপনি একদিন বলিয়াছিলেন; এবার এ-অঞ্চলের মুসলমানগণকে কেরামতে-নেস্‌বতে বায়নান্নাস দেখাইবেন? তা না দেখাইয়াই কি হুজুর এখান হইতে তশরিফ লইয়া যাইবেন? এখানকার মুরিদগণের অনেকেই বলিতেছেন ঃ হুজুর মাঝে মাঝে কেরামত দেখান না বলিয়া উম্মী মুরিদগণের অনেকেই গোমরাহ হইয়া যাইতেছে। মওলানা লকবধারী ঐ ভণ্ডটা ও-পাড়ার অনেক মুরিদকে ভাগাইয়া নিতেছে; সে নাকি বৎসর-বৎসর একবার আসিয়া কেরামত দেখাইয়া যান।

পীর সাহেব গম্ভীর মুখে বলিলেন ঃ (আরবী ও উর্দু) আল্লাহ্‌ই কেরামতের একমাত্র মালিক, মানুষের সাধ্য কি কেরামত দেখায়? ও-সব শয়তানের চেলাদের কথা আমার সামনে বলিও না। তবে হ্যাঁ, মোরাকেবায়ে-নেস্‌বতে বায়নান্নাস-এর তরকিব দেখাইব বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তার আর সময় কোথায়?

সমস্ত সাগরেদ ও মুরিদগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন : না হুজুর, সময় করিতেই হইবে, এবার উহা না দেখিয়া ছাড়িব না।

অগত্যা পীর সাহেব রাজি হইলেন।

স্থির হইল, সেই রাত্রেই মোরাকেবা বসিবে।

সারাদিন আয়োজন চলিল।

রাত্রে মৌলুদের মহফেল বসিল। হযরত পয়গম্বর সাহেবের অনেক অনেক মোওয়াজেযাত বর্ণিত হইল।

মৌলুদ শেষে খাওয়া-দাওয়া হইল এবং তৎপর মোরাকেবার বৈঠক বসিল।

## পাঁচ

পীর সাহেব বলিলেন ঃ আজ তোমাদের আমি যে মোরাকেবার তরকিব দেখাইব, ইহা দ্বারা যে-কোনও লোকের রুহের সঙ্গে কথা বলিতে পারি। আমি যদি নিজে মোরাকেবায় বসি, তবে সেই রুহ্ গোপনে আমার সঙ্গে কথা বলিয়া চলিয়া যাইবে। তোমরা কিছুই দেখিতে পাইবে না। তোমাদের মধ্যে একজন মোরাকেবায় বস, আমি তার রুহের দিকে তোমরা যার কথা বলিবে তার রুহের তাওয়াজ্জোহ দেখাইয়া তারই রুহের ফয়েজ হাসিল করিব। তৎপর তোমরা যে-কেহ তার সঙ্গে কথা বলিতে পারিবে। তোমাদের মধ্যে কে মোরাকেবায় বসিবে?

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

কেহই কোন কথা বলিল না, মোরাকেবায় বসিতে কেহই অগ্রসর হইল না।

এমদাদ দাঁড়াইয়া বলিল ঃ আমি বসিব।

পীর সাহেব একটু হাসিলেন।

বলিলেন ঃ বাবা, মোরাকেবা অত সোজা নয়। তুই আজিও যেকরে খফা-আম করিস নাই, মোরাকেবায় বসিতে চাস?

-বলিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

দেখাদেখি উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিল।

লজ্জায় এমদাদের রাগ হইল। সে বসিয়া পড়িল।

পীর সাহেব আবার বলিলেন ঃ কি, আমরে মুরিদগণের মধ্যে আজিও কারও এতদূর রুহানী তরক্কী হাসেল হয় নাই, যে মোরাকেবায় বসিতে পারে? আমার খলিফাদের মধ্যেও কেহ নাই?

বলিয়া তিনি শাগরেদদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

প্রধান খলিফা সুফী সাহেব উঠিয়া বলিলেন ঃ হুজুর কেবলা কি তবে বান্দাকে হুকুম করিতেছেন? আমি ত আপনার আদেশে কতবার মোরাকেবায়-নেস্‌বতে-বায়নান্নাসে বসিয়াছি। কোনও নূতন লোককে বসাইলে হইত না?

সুফী সাহেব আরও অনেকবার বসিয়াছেন শুনিয়া মুরিদগণের অন্তরে একটু সাহসের উদ্রেক হইল।

তারা সকলে সমস্বরে বলিল ঃ আপনিই বসুন, আপনিই বসুন।

অগত্যা পীর সাহেবের আদেশে সুফী সাহেব মোরাকেবায় বসিলেন।

পীর সাহেব উপস্থিত দর্শকদের দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ কার রুহের ফয়েজ হাসিল করিব? .

মুরিদগণের মুখের কথা যোগাইবার আগেই জনৈক সাগরেদ বলিলেন ঃ এইমাত্র মৌলুদ-শরীফ হইয়াছে; হযরত পয়গম্বর সাহেবের মোয়াজেযা বয়ান হইয়াছে। তাঁরই রুহ্ আনা হোক।

সকলেই খুশী হইয়া বলিলেন ঃ তাই হউক, তাই হউক।

তাই হইল।

সুফী সাহেব আতর-সিক্ত মুখমণ্ডলের গালিচায় তাকিয়া হেলান দিয়া বসিলেন। চারিদিকে আগরবাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। মেশক্ যাফরান ও আতরের গন্ধে ঘর ভরিয়া গেল।

পীর সাহেব তাঁর প্রধান খলিফার রুহে শেষ পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদের রুহ-মোবারক নাযেল করিবার জন্যে ঠিক তাঁর সামনে বসিলেন।

শাগরেদরা চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া মিলিত-কণ্ঠে সুর করিয়া দরুদ পাঠ করিতে লাগিলেন। পীর সাহেব কখনও জোরে কখনোও বা আস্তে নানা প্রকার দোওয়া কালাম পড়িয়া সুফী সাহেবের চোখে-মুখে ফুঁকিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ ফুঁকিবার পর শাগরেদগণকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া পীর সাহেব বুকে হাত বাঁধিয়া একদৃষ্টে সুফী সাহেবের বুকের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুফী সাহেবের বুকের দুইটা বোতাম খুলিয়া তাঁর বুকের খানিকটা অংশ ফাঁক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পীর সাহেব তাঁর দৃষ্টি সেইখানেই নিবদ্ধ করিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যেই সুফী সাহেবের শরীর কাঁপিতে লাগিল। কম্পন ক্রমেই বাড়িয়া গেল। সুফী সাহেব ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন এবং হাত পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে মুর্ছিতের ন্যায় বিছানায় লুটাইয়া পড়িলেন।

পীর সাহেব মুরিদগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ বদর বাবাজীর একটু তগ্‌লিফ হইল! কি করিব? পরের রুহের উপর অন্য রুহের ফয়েজ হাসেল আসানির সঙ্গে করে বেল্‌কুল না-মোমকেন। যা হউক, হযরতের রুহ তশরিফ আনিয়াছেন। তোমরা সকলে উঠিয়া কেয়াম কর।

-বলিয়া তিনি স্বয়ং উঠিয়া পড়িলেন। সকলেই দাঁড়াইয়া সমস্বরে পড়িতে লাগিল ঃ ইয়া নবী সালাম আলায় কা ইত্যাদি।

কেয়াম ও দরুদ শেষ হইলে অভ্যাসমত অনেকেই বসিয়া পড়িল।

পীর সাহেব ধমক দিয়া বলিলেন ঃ হযরতের রুহে পাক এখনও এই মজলিশে হাজির আছেন, তোমরা কেহ বসিতে পারিবে না। কার কি সওয়াল করিবার আছে করিতে পারে।

এমদাদ একটা বিষয় ধাঁধায় পড়িয়া গেল। সে ইহাকে কিছুতেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারিল না।

-মাথায় এক ফন্দি আঁটিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল ঃ কেবলা আমি কোন সওয়াল করিতে পারি?

পীর সাহেব চোখ গরম করিয়া বলিলেন ঃ যাও না, জিজ্ঞাসা কর না গিয়া!

-বলিয়া কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত মোলায়েম করিয়া আবার বলিলেন ঃ বাবা সকলের কথাই যদি রুহে পাকের কাছে পৌঁছিত, তবে দুনিয়ার সব মানুষই ওলি-আল্লাহ হইয়া যাইত।

এমদাদ তথাপি সুফী সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিল ঃ আপনি যদি হযরত পয়গম্বর সাহেবের রুহ হন, তবে আমার দরুদ-সালাম জানিবেন।

হযরতের রুহ কোন জবাব দিলো না।

পীর সাহেব এমদাদের কাঁধে হাত দিয়া তাকে একদিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন ঃ অধিকক্ষণ রুহে পাককে রাখা বে-আদবি হইবে। তোমাদের যদি কাহারও সিনা সাফ হইয়া থাকে, তবে আসিয়া যে কোন সওয়াল করিতে পার।

-বলিতেই পীর সাহেবের অন্যতম খলিফা মওলানা বেলায়েতপুরী সাহেব অগ্রসর হইয়া 'আস্সালামো আলায়কুম ইয়া রসূলুল্লাহ' বলিয়া সুফী সাহেবের সামনে দাঁড়াইলেন।

সকলে বিস্মিত হইয়া শুনিল সুফী সাহেবের মুখ দিয়া বাহির হইল ঃ ওয়া আলায়কুমস্ সালাম, ইয়া উম্মতী।

মওলানা সাহেব বলিলেন ঃ হে রেসালাত-পনা, সৈয়দুল্ কাওনায়েন, আমি আপনার খেদমতে একটা আরজ করিতে চাই।

আওয়াজ হইল ঃ শীগগির বল, আমার আর দেরী করিবার উপায় নাই। মওলানা ঃ আমাদের পীর দস্তগির কেবলা সাহেব নূরে-ইয-দানির জওয়াশা সহ্য করিতে পারেন না, ইহার কারণ কি? তার আমলে কি কোনও গলৎ আছে?

কঠোর সুরে উত্তর হইল ঃ হাঁ, আছে।

পীর সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি কাঁদ-কাঁদ সুরে নিজেই বলিলেন ঃ কি গলৎ আছে, 'ইয়া রসূলুল্লাহ? আমার পঞ্চাশ বৎসরের রঞ্জ-কশি কি তবে সব পন্ড হইয়াছে?

-বলিয়া পীর সাহেব কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সুফী সাহেবের অচেতন দেহের মধ্যে হইতে আওয়াজ হইল ঃ হে আমার পিয়ারা উম্মৎ, ঘাবড়াইও না। তোমার উপর আল্লাহর রহমৎ হইবে। তুমি মারফৎ খুঁজিতেছ। কিন্তু শরীয়ত ত্যাগ করিয়া কি মারফৎ হয়?

পীর সাহেব হাত কচলাইয়া বলিলেন ঃ হুজুর, আমি কবে শরীয়ত অবহেলা করিলাম?

উত্তর হইল ঃ অবহেলা কর নাই, কিন্তু পালনও কর নাই। আমি শরিয়তে চার বিবি হালাল করিয়াছি। কিন্তু তোমার মাত্র তিন বিবি। যারা সাধারণ দুনিয়াদার মানুষ তাদের এক বিবি হইলেও চলিতে পারে। কিন্তু যারা রুহানী ফয়েজ হাসিল করিতে চায়, তাদের চার বিবি ছাড়া উপায় নাই! আমি চার বিবির ব্যবস্থা কেন করিয়াছি, তোমরা কিছু বুঝিয়াছ? চার দিয়াই এ দুনিয়া, চার দিয়াই আখেরাত। চারদিকে যা দেখ সবই খোদা চার চিজ দিয়া পয়দা করিয়াছেন। চার চিজ দিয়া খোদাতা'লা আদম সৃষ্টি করিয়া তার হেদায়েতের জন্য চার কেতাব পাঠাইয়াছেন। সেই হেদায়েত পাইতে হইলে মানুষকে চার এমামের চার তরিকা মানিয়া চলিতে হয়। এইভাবে মানুষকে চারের ফাঁদে ফেলিয়া খোদাতা'লা চার কুরসির অন্তরালে লুকাইয়া আছেন। এই চারের পরদা ঠেলিয়া আলমে-আমরে-নূরে-ইয়্দানিতে ফানা হইতে হইবে, দুনিয়াতে চার বিবির ভজনা করিতে হইবে।

পীর সাহেব সকলকে শুনাইয়া হযরতের রুহের দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ এই বৃদ্ধ বয়সে আবার বিবাহ করিব?

-তুমি বৃদ্ধ? আমি ষাট বৎসর বয়সে নবম বার বিবাহ করিয়াছিলাম।

পীর সাহেব মিনতি ভরা কণ্ঠে বলিলেন ঃ না রেসালাত-পানা আমি আর বিবাহ করিব না।

-না কর, ভালই। কিন্তু তোমার রুহানী কামালিয়ত হাসেল হইবে না, তুমি নূরে-ইযদানির জলওয়া বরদাশত করিতে পারিবে না। তোমার মুরিদানের কেহই নফসানিয়তের হাত এড়াইতে পারিবে না।

পীর সাহেব হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিলেন ঃ আমি নিজের জন্য ভাবি না ইয়া রসূলুল্লাহ; কিন্তু যখন আমার মুরিদগণের অনিষ্ট হইবে, তখন বিবাহ করিতে রাজি হইলাম। কিন্তু আমি এক বুড়িকে বিবাহ করিব।

-তুমি তওবা আসতাগফার পড়। তুমি খোদার কলম রদ করিতে চাও? তোমার বিবাহ ঠিক হইয়া আছে। বেহেশতে আমি তার ছবি দেখিয়া আসিয়াছি।

-সে কে, ইয়া রসূলুল্লাহ?

-এই বাড়ির তোমার মুরিদের ছোট ছেলে রজবের স্ত্রী কলিমন।

-ইয়া রসুলুল্লাহ, আমি মুরিদের স্ত্রীকে বিবাহ করিব? সে যে আমার বেটার বউ-এর শামিল।

-ইয়া উম্মতি, আমি আমার পালিত পুত্র যায়েদের স্ত্রীকে নিকাহ্ করিয়াছিলাম, আর তুমি একজন মুরিদের স্ত্রীকে নিকাহ্ করিতে পারিবে না?

ইয়া রসূল্লাহ, সে যে সধবা।

রজবকে বল স্ত্রীকে তালাক দিতে। কলিমন তোমার জন্যই হালাল। এ মারফতি নিকায় ইদ্দত পালনের প্রয়োজন হইবে না। আমি আর থাকিতে পারি না। চলিলাম। অররহমাতুল্লাহ আলায়কুম, ইয়া উম্মতি।

মূৰ্ছিত সুফী সাহেব একটা বিকট চিৎকার করিলেন। পীর সাহেবের অপর-অপর শাগরেদরা তাঁকে সজোরে পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

মুরিদগণের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও পীর সাহেব মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন ঃ চাই না আমি রুহানী কামালিয়ত। আমি মুরিদের বউকে বিবাহ করিতে পারিব না।

গ্রাম্য মুরিদগণ আখেরাতের ভয়ে পীর সাহেবের অনেক হাতে-পায়ে ধরিল। পীর সাহেব অটল।

এই সময় প্রধান খলিফা সুফী সাহেব স্মরণ করাইয়া দিলেন ঃ এই নিকাহ না করিলে কেবল পীর সাহেবের একারই রুহানী লোকসান হইবে না, তাঁর মুরিদগণের সকলের রুহের উপরও বহুত মুসিবত পড়িবে। তখন পীর সাহেব অগত্যা নিজের রেজামন্দী জানাইয়া দাঁড়িতে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিতে লাগিলেন ছোবহান আল্লাহ! এ সবই কুদরতে এলাহী! তাঁরই শানে-আজিম! আল্লাহ্ পাক নিজেই কোরান-মজিদ ফরমাইয়াছেন ঃ (আরবী ও উর্দু).....।

বাপ-চাচা পাড়া-পড়শীর অনুরোধে, আদেশে, তিরস্কারে ও অবশেষে উৎপীড়নে তিষ্টিতে না পারিয়া রজব তার এক বছর আগে বিয়া-করা আদরের স্ত্রীকে তালাক দিলো এবং কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

কলিমনের ঘন-ঘন মূর্চার মধ্যে অতিশয় ত্রস্ততার সঙ্গে শুভকার্য সমাধান হইয়া গেল।

এমদাদ স্তম্ভিত হইয়া বর বেশে সজ্জিত পীর সাহেবের দিকে চাহিয়া ছিল। তার চোখ হইতে আগুন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতেছিল।

এইবার তার চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে এক লাফে বরাসনে-উপবিষ্ট পীর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁর মেহেদী-রঞ্জিত দাড়ি ধরিয়া হেচ্‌কা টান মারিয়া বলিল ঃ রে ভণ্ড শয়তান! নিজের পাপ-বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য দুইটা তরুণ প্রাণ এমন দুঃখময় করিয়া দিতে তোর বুকে বাজিল না?

আর বলিতে পারিল না। শাগরেদ-মুরিদরা সকলে মার্ মার্ করিয়া আসিয়া এমদাদকে ধরিয়া ফেলিল এবং চড়-চাপড় মারিতে লাগিল।

এমদাদ গ্রামের মাতব্বর সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিল ঃ তোমরা নিতান্ত মূর্খ। এই ভণ্ডের চালাকি বুঝিতে পারিতেছ না? নিজে শখ মিটাইবার জন্য সে হযরত পয়গম্বর সাহেবকে লইয়া তামাসা করিয়া তাঁর অপমান করিতেছে। তোমরা এই শয়তানকে পুলিশে দাও।

পীর সাহেবের প্রতি এমদাদের বেয়াদবিতে মুরিদরা ইতিপূর্বে একটু অসন্তুষ্ট হইয়া ছিল। এবার তার মস্তিষ্ক বিকৃতি সম্বন্ধে তারা নিঃসন্দেহ হইল। মাতব্বর সাহেব হুকুম করিলেন ঃ এই পাগলটা আমাদের হুজুর কেবলার অপমান করিতেছে। তোমরা কয়েকজন ইহাকে কান ধরিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিয়া আস।

ভূলুণ্ঠিত পীর সাহেব ইতিমধ্যে উঠিয়া 'আস্‌তাগফেরুল্লাহ' পড়িতে পড়িতে তাঁর আলুলায়িত দাড়িতে আঙ্গুল দিয়া চিরুণী করিতেছিলেন। মাতব্বর সাহেবের হুকুমের পিঠে তিনি হুকুম করিলেন ঃ দেখিস বাবারা, ওকে বেশি মারপিট করিস না। ও পাগল। ওর মাথা খারাপ। ওর বাপ ওকে আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিল। অনেক তাবিজ দিলাম। কিন্তু কোন ফল হইল না। খোদা যাকে সাফা না দেন, তাকে কে ভাল করিতে পারে? (আরবী ও উর্দু)।

# গো-দেওতা কা দেশ

দিনটাও ছিল বেজায় গরম, মেজাজটাও ছিল নিতান্ত চড়া। রাত না পোহাতেই বিবির সাথে ঝগড়া হওয়ায় প্রতিজ্ঞা করিলাম ঃ আজ বাসায় থাকিব না; সারাদিন বাহিরে থাকিয়া বিবিকে একটু শাস্তি দিব।

কিন্তু যাই-ই বা কোথায় ছাই! জামা-কাপড় লইয়া আড়চোখে বিবির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া লইলাম। বিবি ভ্রুক্ষেপও করিল না। রাগ আমার আরও বাড়িয়া গেল। জোরে জোরে পা ফেলিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িলাম।

বন্ধু রশিদের বাসায় আসিয়া দেখিলাম ঃ প্রচণ্ড আড্ডা, বিষম কোলাহল। আমাকে দেখিয়া সবাই একযোগে চিৎকার করিয়া উঠিল ঃ চল, নৌকা ভ্রমণে যাওয়া যাক।

বাড়ির বাহিরে সারাদিন, চাই কি সারা সপ্তাহে, কাটাইয়া দিবার যে কোন সুযোগে আমার আনন্দিত হইবার কথা। কিন্তু নৌকা ভ্রমণের কথা শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

ছেলে বেলা এক বেটা গণক বলিয়াছিল যে, আমার মৃত্যু পানিতে ডুবিয়া! সেই হইতে আমি নদী তো চুলায় যাক, পুকুরেও গোসল করিতাম না।

তারপর কলিকাতায় আসিয়া পুকুরের বদলে পানির কলের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলাম।

নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়া একবার বর্ষাকালে পল্লীগ্রামের বাড়িতে যাইতে হইয়াছিল; প্রায় পনর হাত প্রশস্ত এক নদীর খেয়া পার হইতে গিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া খোদার নাম লইয়া নৌকায় উঠিলাম। পাঁচ ছয় জন আরোহীর ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া আল্লাহ্‌র নাম যপ করিতে লাগিলাম। কিন্তু নৌকা যেই মাঝ্ নদীতে গিয়া পড়িল, অমনি হাঁটু দু'টি ঠকঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি মূর্ছিত হইয়া পড়িলাম।-

নৌকা ভ্রমণের কথা শুনিয়া আমার সে কথা মনে পড়িয়া গা কাঁটা দিয়া উঠিল। মনটা নিতান্ত দমিয়া গেল।

কি করিব ভাবিতে লাগিলাম।

কিন্তু আমার জিদ্ হইয়াছিল বিবিকে শাস্তি দিতেই হইবে। কেন সে আসিবার সময় আমাকে বাধা দিল না? তাকে শাস্তি দিবার জন্য আমি আত্মহত্যা করিতেও প্রস্তুত আছি। কাজেই নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও আমি বন্ধুদের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলামঃ নৌকা-ভ্রমণে যাইব।

এই বেফাস কথাটা বলিয়া ফেলিয়া মনটাই খারাপ হইয়া গেল। বন্ধুরা নৌকা-যাত্রার বিধি-ব্যবস্থার কথা আলোচনা করিতে লাগিল। আমার কিছুই ভাল লাগিল না।

বিকালে প্রস্তুত থাকিতে উপদিষ্ট হইয়া আমি মাতালের মতো টলিতে টলিতে বিদায় হইলাম।

বাসায় ফিরিয়া বিবিকে শুনাইয়া চিৎকার করিয়া আমার এই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা চাকরকে জ্ঞাপন করিলাম। বিবির উদ্দেশ্যে রান্না-ঘরের দরজার দিকে দুই একটা কটাক্ষও করিলাম।

কিন্তু সে রান্নাঘর হইতে বাহির হইল না।

রান্নাঘরের সম্মুখ দিয়া বার সাতেক হাঁটাহাঁটি করিলাম, তথাপি সে একবার চাহিয়া দেখিল না। ছুরি হারাইয়া যাওয়ার ভান করিয়া বঁটিতে পেন্সিল কাটিবার জন্য রান্নাঘরে গেলাম এবং বঁটি খুঁজিয়া না পাওয়াতে বিবির কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তথাপি সে কথা বলিল না, কেবল ইঙ্গিতে পার্শ্ববর্তী বঁটিটা দেখাইয়া দিল।

পেন্সিল কাটিবার কোনও দরকার ছিল না, ছুরিও সশরীরে টেবিলের উপর বিরাজ করিতেছিল। সুতরাং রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম!

এইবার ঘরে আসিয়া পেন্সিলটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলাম। বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া-শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম। চোখের পানিতে বালিশ ভিজিতে লাগিল।

আমি নৌকা-ভ্রমণে গিয়া পানিতে ডুবিয়া মরিলে বিবি কাঁদিবে কিনা, আবার বিবাহ করিবে কি না, করিলে কতদিন পরে করিবে, এবং কাকে করিবে, এই লইয়া মনে বিষম তোলপাড় আরম্ভ হইল।

চোখ বুজিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম।

## দুই

বন্ধু আসিয়া বাহির হইতে হাঁকাহাকি আরম্ভ করিল।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাহির হইলাম। চল, বলিয়া বন্ধুরা রওয়ানা হইল।

আমার তখনও নাওয়া হয় নাই। ক্ষুধা তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

তথাপি তাদের পিছু লইলাম; অনাহারের কথা তাদের জানাইলাম না। অল্পক্ষণ পরেই যে পানিতে ডুবিয়া মরিবে, তার আর আহার অনাহার কি?

অফিস আর বাসা, বাসা আর অফিস- ইহাই আমার যাতায়াতের স্থান। সুতরাং বর্ষায় গঙ্গা যে সাগর হইয়া বসিয়া আছে, সে খবর আমার জানা ছিল না।

মাথা হইতে পা পর্যন্ত ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল।

বন্ধুরা বিরাট হল্লা করিয়া নৌকায় উঠিল।

আমি নিতান্ত অন্যমনস্ক হইয়া তখনও তীরেই দাঁড়াইয়াছিলাম। ডাকা-ডাকিতে চমক ভাঙিল।

আমি উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে শেষ চুম্বন দিয়া আল্লাহ্‌র নাম করিতে করিতে, ফাঁসির আসামী যেমন করিয়া মঞ্চে আরোহণ করে ঠিক তেমনি করিয়া নৌকায় আরোহণ করিলাম।

নৌকা চলিতে লাগিল।

বন্ধুরা গান করিতে লাগিল, কি কোলাহল করিতে লাগিল আমার ঠিক মনে নাই। বোধ হয় গানই হইবে। কারণ গানের আয়োজন করা হইয়াছিল।

আমার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। আমি আকাশের দিকে চাহিয়াছিলাম।

দেখিলাম ঃ পশ্চিমাকাশে মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘের মধ্যে আমি আজরাইল ফেরেশতার মুখ দেখিতে পাইলাম, তিনি আমার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিয়া তাঁর চরদিগকে কি বলিতেছেন।

ব্যাপার কি বুঝিতে আমার বাকি রহিল না।

বন্ধুদের কোলাহলে আমার ধ্যানভঙ্গ হইল।

দেখিলাম ঃ তারা সবাই চিৎকার করিতেছে। সবারই মুখে আতংক ফুটিয়া উঠিয়াছে। নৌকা বিষম দুলিতেছে।

বুঝিলাম ঃ ঝড় উঠিয়াছে। নৌকা তীরে ভিড়াইবার জন্য সবাই মাঝিকে গালাগালি করিয়া উপদেশ বর্ষণ করিতেছে।

আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম; সুতরাং গোলমালে যোগ দিলাম না।

ঝড়ের বেগ বাড়িয়া গেল। বন্ধুরা কাপড়-চোপড় খুলিয়া পানিতে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

আমি নিরুদ্বেগে বসিয়া রহিলাম।

একটা প্রকাণ্ড ধমকা হাওয়া আসিয়া নৌকা উল্টাইয়া ফেলিল। বন্ধুরা 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া পানিতে ঝাঁপ দিল।

আমি একটুও নড়িলাম না। সাঁতার দিবারও চেষ্টা করিলাম না; কারণ ও বিদ্যা আমার জানা ছিল না।

আমি ধীরে ধীরে তলাইয়া যাইতে লাগিলাম।

কিন্তু মরিলাম না।

কিসের ধাক্কায় আবার ভাসিয়া উঠিলাম। উপরের দিকে চাহিয়া আকাশ দেখিলাম, চারিদিকে চাহিয়া অনন্ত জলরাশি দেখিলাম, কিন্তু কোথাও কোন জন-প্রাণী দেখিতে পাইলাম না।

পানির স্রোতে ভাসিয়া চলিলাম।

কতক্ষণ, কতদিন বা কতমাস সেইভাবে ভাসিয়া গেলাম, ঠিক স্মরণে পড়িল না।

হঠাৎ নিজের অনাহারের কথা মনে পড়িল। তৃষ্ণা বোধ করিলাম।

পানিতেই ভাসিতেছিলাম, সুতরাং পানির অভাব ছিলো না; ঠোঁট খুলিয়া এক ঢোক পানি গিলিয়া ফেলিলাম।

একি! এত চমৎকার পানি! একেবারে দুধের মতো স্বাদ।

আমি মাথা উঁচু করিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম; কেবল স্বাদই নহে, রংও দুধের মতো।

অবাক হইয়া গেলাম। এ কোন দেশে আসিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

ভাসিয়া যাইতে লাগিলাম।

আরও কতদিন ভাসিয়া গেলাম, তার হিসাব নাই।

অবশেষে একদিন হঠাৎ শরীরে কিসের ধাক্কা লাগিল।

আমি হাত দিয়া দেখিলাম ঃ শক্ত জিনিস, হয়তো বা পাথর হইবে। ফিরিয়া দেখিলাম, পাথর ত বটেই, তা ছাড়া খানিক দূরে স্থলও দেখা যাইতেছে।

আমি পায়ে ভর করিলাম। মাটি ঠেকিল। হাঁটিয়া কুলের দিকে অগ্রসর হইলাম। নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। বহু কষ্টে পা টানিয়া টানিয়া দুগ্ধ-সাগর অতিক্রম করিয়া তীরে উঠিলাম।

দেখিলাম ঃ পাথরের দেশ। পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে দুধের নহর বহিয়া সাগরে পড়িতেছে।

সেই নহর উজাইয়া আমি আরও অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম পালে পালে গরু এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে। আমি অবাক হইয়া গেলাম এতসব গরু কার?

আরও অগ্রসর হইলাম। কিন্তু একজন মানুষও দেখিতে পাইলাম না।

গুরুগুলি আমাকে দেখিয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

আমি অবলা গো-জাতির এই ভাব দর্শনে বিস্মিত হইলাম।

হঠাৎ পাল হইতে একটা গাভী আমার দিকে অগ্রসর হইয়া কথা বলিতে লাগিলো। বিশুদ্ধ হিন্দি ভাষায় আমাকে বলিল ঃ তুমি দেখিতেছ মানুষ জাতি। তুমি কি করিয়া আজও বাঁচিয়া আছ বাবা?

আমি গভীর বিশুদ্ধ হিন্দী কথায় অবাক হইলাম। বলিলাম ঃ বাঁচিয়া থাকিব না কেন? কি হইয়াছে? তোমার এ প্রশ্নের উত্তর কি?

গাভী হাসিয়া বলিল ঃ তুমি দেখিতেছি কিছু জান না। আচ্ছা, তুমি কোনদেশী লোক, বাবা?

বলিলাম ঃ আমি বাংলাদেশের লোক।

সমস্ত গরু একযোগে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। গাভী দন্তবিকাশ করিয়া বলিল ঃ আপনি তবে 'আনন্দবাজার'-এর দেশের লোক।

আমি আরও আশ্চর্য হইয়া বলিলাম ঃ 'আনন্দবাজার'-এর দেশ কেমন?

গাভী বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফোরিত করিয়া বলিল ঃ 'আনন্দবাজার'! কেন, 'আনন্দবাজার' চেন না? 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। আহা, সেই কাগজের সম্পাদক আমাদের জাতির রক্ষা করিবার জন্য কাগজে কত আন্দোলনই না করিয়াছেন।

-বলিয়া বৃদ্ধ গাভী 'আনন্দবাজার'-সম্পাদকদের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিবার জন্য সামনের দুইটা পা কপালে ঠেকাইবার চেষ্টা করিয়া পড়িয়া গেল।

আমি অসহ্য কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ এদেশে কি মানুষ নাই?

গাভী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল ঃ সেই কথাইত তোমাকে বলিতে চাহিয়াছিলাম। আচ্ছা, চল আমাদের দলপতির নিকট। তিনিই সব কথা তোমাকে খুলিয়া বলিবেন।

-বলিয়া আমাকে লইয়া সে অগ্রসর হইল।

সমস্ত গরু আমাদের পিছু লইল।

অগ্রসর হইতে-হইতে দেখিলাম ঃ চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল গরু আর গরু! হাজার লক্ষ কোটি কি পদার্থ হইবে তা অনুমান করা গেল না।

আমার বিস্ময় বাড়িতে লাগিল।

গাভী আমাকে তাদের সরদারের নিকট হাজির করিল।

দেখিলাম ঃ সরদার একটা বৃদ্ধ বলদ। তার কপালে চন্দনের ত্রিশুল ও মাথায় টিকি আছে এবং একটা বন্য লতা সামনের দু'পায়ের ভিতর দিয়া শরীর বেষ্টন করিয়া বুঝি বা পৈতার কাজ করিতেছে।

গাভী সরদারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল ঃ প্রভু, 'আনন্দবাজার'র দেশের একটা লোক কি অজ্ঞাত উপায়ে আজও বাঁচিয়া আছে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

বলদ আসন হইতে উঠিয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমি আমার অভ্যাসমত এক হাত তুলিয়া সালামের ভঙ্গিতে প্রত্যাভিবাদ করিলাম।

বলদ গাভীর দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিল। তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিল ঃ তুমি কোন জাত?

আমি বললাম ঃ মুসলমান।

বলদের রোমাঞ্চ হইল।

চতুর্দিকে সমস্ত গরুর পাল হইতে 'অনার্য' 'ম্লেচ্ছ' বলিয়া চিৎকার উঠিল।

গাভীটা "আমার জাত গিয়াছে গো, মুচুনমানটাকে আমি ছুঁইয়া ফেলিয়াছি। কাশীও ডুবিয়া গিয়াছে। হায় হায়, আমি কোথায় গিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিব গো"-বলিয়া সম্মুখের একটা পা কপালে ঠেকাইবার চেষ্টা করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি অবাক হইয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম। দেখিলাম ঃ ক্ষিপ্ত ষাঁড়গুলো শিং বাঁকাইয়া আমাকে গুঁতাইতে আসিতেছে।

আমি বিপদ গণিলাম।

হঠাৎ শুনিলাম, সরদার বলদটা উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া বলিল ঃ বৎসগণ, এই আর্যভূমিতে একটিমাত্র মানুষ বাঁচিয়া আছে। সে আর্য হোক অনার্য হোক তাকে মারা যায় না। মানবজাতিকে নির্মূল করা উচিত নয়। তোমরা শিং সামলাও।

সমস্ত গরু শিং সংযত করিল।

আমি বাঁচিয়া গেলাম।

সরদার আমার দিকে চাহিয়া বলিল ঃ বৎস, তোমাদের জাত আমাদের গোজাতি ধ্বংস করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছে। তথাপি আজ তোমাকে আমরা ক্ষমা করিলাম। আর্যভূমিতে বুদ্ধ, চৈতন্য, গান্ধি প্রভৃতি অনেক মহাপুরুষ ক্ষমা ও প্রেম প্রচার করিয়াছেন। তাদের সম্মানের জন্য আমরা শত্রুকেও ক্ষমা করিলাম। তোমার কোনও ভয় নেই।

আমি সাহস পাইয়া বলিলাম ঃ সরদার, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি এ কোন দেশে আসিয়াছি?

বলদ বলিল ঃ এ-জায়গার নাম ছিল হিমালয়। ভারতবর্ষ বাসের অযোগ্য হইয়া যাওয়ায় আমরা এই পর্বতে আশ্রয় লইয়াছি।

আমি অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলাম! ভারতবর্ষ বাসের অযোগ্য হইয়া গেল কিরূপে?

বলদ বলিল ঃ সমস্ত দেশ দুধে ডুবিয়া গিয়াছে।

আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ ভারতের মানুষেরা সব গেল কোথায়?

বলদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল ঃ সব মরিয়া গিয়াছে।

আমি শিহরিয়া উঠিলাম! অতিকষ্টে বলিলাম ঃ কিরূপে?

বলদ বলিল ঃ তবে বসিয়া শোন।

## তিন

আমি মাটিতে বসিয়া পড়িলাম।

বলদ বলিতে লাগিল ঃ এই দেশে হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্ম-সম্প্রদায় বাস করিত। ইংরেজ নামে—

বাধা দিয়া আমি বলিলাম ঃ সে-কথা আমি জানি।

বলদ ঈষৎ উষ্ণ হইয়া বলিল ঃ বাধা দিও না, শুনিয়া যাও।

আমি অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিলাম।

বলদ আরম্ভ করিল ঃ ইংরাজ নামে এক বিদেশী জাতি এই দেশ শাসন করিত। তারা এদেশের উপর সুবিচার করিত না। তাই হিন্দু-মুসলমান একযোগে ইংরাজের হাত হইতে দেশ উদ্ধার করিবার জন্য স্বরাজ আন্দোলন আরম্ভ করিল। দেশ সুদ্ধ লোক ইংরাজের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিল। ইংরাজের রাজত্ব যায় আর-কি!

এমন সময় ইংরাজ হিন্দুদের কয়েকজনকে ডাকিয়া কানে-কানে কি বলিল! হিন্দুদের মধ্যে আর্যসমাজ নামে এক দল বাহির হইল। তারা চিৎকার করিয়া হিন্দুদিগকে বলিতে লাগিল ঃ ইংরাজ গো-মাতার হত্যাসাধন করে বলিয়াই ত আজ আমরা ইংরাজ তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমাদের সঙ্গীরাই যে গো-হত্যা করে, তাদের আমরা কি করিব?

হিন্দুরা ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল ঃ তাই তো!

মুসলমানদিগকে বলিল ঃ তোমরা যদি এদেশে থাকিতে চাও তবে গরু খাওয়া ছাড়। অন্যথায় ইংরেজের সঙ্গে একই জাহাজে চড়িয়া পশ্চিমের দিকে সাগর পাড়ি দাও।

মুসলমান বলিল ঃ বাঃ রে? আমরা বুঝি এদেশের কেউ নই? কেন আমরা এদেশ ছাড়িয়া যাইব?

হিন্দুরা বলিল ঃ এদেশ না ছাড়, গরু খাওয়া ছাড়।

মুসলমান জাতটা ছিল বড় একগুয়ে; আমাদের ধ্বংস করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্যে।

তারা বাঁকিয়া বসিল। বলিল ঃ আমরা গরু খাওয়া ছাড়িব না, এদেশও ছাড়িব না। কারণ গরু আমাদের খাদ্য এবং এদেশ আমাদের জন্মভূমি।

হিন্দুরাও রাগিয়া গেল। বলিল ঃ তবে রে বেটারা! আমাদের দেশে বাস করিয়া আমাদেরই সঙ্গে আড়ি। জলে বাস করিয়া কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া? ইংরাজ তাড়াইবার আগে তোদেরই এদেশ হইতে তাড়াইব।

মুসলমানরাও বলিল ঃ আস তবে, আজ একহাত হইয়া যাক্। উভয় দলে সাজ সাজ সাড়া পড়িয়া গেল।

গো-রক্ষা আন্দোলনের প্রবর্তক আর্যসমাজীরা হিন্দুদিগকে বলিল ঃ সবাই মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেলে গো-মাতার সেবার অসুবিধা হইবে। তোমরা যুদ্ধে যাও, আমরা গরুর ঘাস কাটি।

হিন্দুরা দেখিল ঃ কথা মন্দ নয়। যে গো-দেবতার জন্য যুদ্ধ, তার সেবার ত্রুটি হইলে দেবতাও অসন্তুষ্ট হইবেন, যুদ্ধ করাও ব্যর্থ হইবে।

হিন্দুরা বলিল ঃ তথাস্তু।

আর্যরা গরুর ঘাস কাটিতে গেল।

হিন্দুরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতরণ করিল।

ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল! দিনরাত অবিরাম লড়াই চলিতে লাগিল।

ইংরাজ দেখিল ঃ এভাবে রাজ্য শাসন করা চলে না। অতএব তারা পুলিশ দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা করিতে লাগিল।

যুদ্ধক্ষেত্রের আশ-পাশে ঘাস কাটা নিরাপদ নয় মনে করিয়া এবং যোদ্ধাগণের হস্তচ্যুত তরবারি গো-দেবতার গায়ে লাগিয়া গো-হত্যা পাপের অনুষ্ঠান হইতে পারে ভয়ে, আর্য-সমাজীরা ভারতের সমস্ত গরু লইয়া বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ডিং-এ আশ্রয় লইল।

ইংরাজ তার সমস্ত সৈন্য-সামন্ত লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত থাকিল। সুতরাং খুব শান্তির সঙ্গেই যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হইতে লাগিল। অবশেষে উভয় পক্ষের সকলেই নিহত হইল, একজন লোকও বাঁচিয়া রহিল না।

সুতরাং যুদ্ধ থামিয়া গেল।

স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল দেখিয়া ইংরাজ নিশ্চিন্ত আনন্দে ক্লাবে ফিরিয়া গেল।

কিন্তু অধিকদিন আরামে কাটিল না। ত্রিশকোটি লাশ যখন একসঙ্গে পচিতে আরম্ভ করিল, তখন তা হইতে অসহ্য দুর্গন্ধ বাহির হইল।

ইংরাজ নাক বন্ধ করিয়া এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। নাকে এসেন্সের ছিপি চব্বিশ ঘন্টাই ঢুকাইয়া রাখিল। কিন্তু কোনও ফল হইল না।

কতক দুর্গন্ধে, কতক কলেরায়, অল্পদিনেই সমস্ত ইংরাজও মরিয়া গেল। আর্য-সমাজীরা ইতিমধ্যে আমাদিগকে লইয়া কাশীর মন্দিরে আশ্রয় লইল। কাশী নিতান্ত পূণ্যস্থান, তাই সেখানে দুর্গন্ধ প্রবেশ করিল না। আমাদিগকে লইয়া সেখানে আর্যরা নিশ্চিন্তে বাস করিতে লাগিল।

কিছুদিন গেল এইভাবে।

ইংরাজ ও মুসলমানদের অনুপস্থিতিতে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ করিয়া আমাদের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

দুধের আতিশয্যে আমাদের 'পরিবার'দের বাঁট ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু দোয়াইবার বা খাইবার লোকের নিতান্ত অভাব।

মুষ্টিমেয় আর্য আর কত দুধ খাইবে?

দুধের টাটানিতে আমাদের 'পরিবার'রা ছটফট্ করিতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া তাহারা মাটিতে, গাছের গুঁড়িতে বাঁট ঘষিতে লাগিল। তাতে প্রচুর দুধ বাহির হইয়া গেল। সকলে যৎকিঞ্চিত আরাম পাইল।

# চার

সেই হইতে ঐ উপায়ে দুধ বাহির করা চলিতে লাগিল।

ফলে যা হইল, তা আমরাও আগে কল্পনা করি নাই। অসংখ্য গাভীর দুধে নগর-শহর, পল্লী-পাথার ভাসিয়া যাইতে লাগিল। জলের স্রোতের মতো দুগ্ধ প্রবাহিত হইয়া নদী-নালা, খাল-বিল সমস্তই ভরিয়া গেল। সে সমস্তেও যখন আর ধরিল না তখন ক্রমে দেশ ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে কাশীতেও বাস করা অসম্ভব হইল। সমস্ত বাড়িঘর দুধে ডুবিয়া গেল।

আর্য সমাজীরা বলিল ঃ চল, পাহাড়ে গিয়া চড়ি।

আমরা সকলে দুধের সাগরে সাঁতার কাটিতে-কাটিতে হিমালয় পর্বতের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

মানুষজাতি আমাদের মতো কষ্টসহিষ্ণু নয়। পথে এক এক করিয়া সমস্ত আর্য দুধের সাগরে ডুবিয়া মরিল।

আমরা বহুকষ্টে এই পাহাড়ে চড়িয়া আত্মরক্ষা করিলাম।

সেই হইতে পাহাড়ে চড়িয়া বাস করিতেছি; কিন্তু দুধের পরিমাণ যেভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে তাতে অতি শীঘ্র পর্বতও ডুবিয়া যাইবে। তখন আমরা কোথায় যাইব তা ভাবিয়া নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। তোমার আসিবার আগে আমরা সে কথাই আলোচনা করিতেছিলাম। ঐ যে দুধের বান আসিতেছে। সতর্ক হও।

—বলিতে বলিতে বলদ খাড়া হইয়া উঠিল।

আমি ভয় পাইয়া পিছন ফিরিলাম। দেখিলাম ঃ দুধের বিরাট ঢেউ পর্বত প্রমাণ উঁচু হইয়া আমাদের দিকে আসিতেছে।

বলদ এক লাফে দশ হাত দূরে ছিটকাইয়া পড়িল এবং লেজ তুলিয়া দৌড় মারিল।

আমি নড়িবার অবসর পাইলাম না। প্রকাণ্ড একটা ঢেউ আসিয়া আমাকে তলাইয়া ফেলিল।

আমার শ্বাস বন্ধ হইয়া গেল।

আমি কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া গোঙাইয়া উঠিলাম।

আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

দেখিলাম ঃ সেই প্রচণ্ড গরমে আমি তিন-চারটা লেপ-চাপা পড়িয়া আছি! ঘামে সর্বশরীর ভিজিয়া গিয়াছে। আমার স্বপ্নের আমেজ তখনও কাটে নাই। ব্যাপার কি ভাবিতে লাগিলাম।

হঠাৎ স্ত্রীর খিল্‌খিল্‌ হাসিতে আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

স্ত্রী হাসিতে হাসিতে বলিল ঃ রাগ করিয়া নৌকা-ভ্রমণে যাওয়া হইতেছিল বুঝি? নাও আর রাগের সুবিধা হইল না। গোসল করিয়া ভাত খাও।

—বলিয়া একখানা কাগজ হাতে দিল।

দেখিলাম রশিদ লিখিয়াছে ঃ গায়ক সুরেন বাবুর অসুখ হওয়ায় আজ নৌকা-ভ্রমণ স্থগিত রাখা হইল।

# নায়েবে নবী

ওয়াযের মজলিস্।

গ্রামের মাতব্বরের বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে শামিয়ানা টাঙাইয়া বসিবার জায়গা করা হইয়াছে।

বহু যোগাড়-যন্ত্র করিয়া এই মহফেলটি ডাকা হইয়াছে। সাতদিন পূর্ব হইতে ঘোষণা এবং তিনদিন আগে হইতে তাগিদ করিবার পরও যাহারা স্বেচ্ছায় মহফেলে যোগদান করে নাই এবং স্বয়ং ওয়ায়েয সাহেবের পুনঃ অনুরোধে মাতব্বর সাহেব একাধিকবার লোক পাঠাইয়া যাহাদিগকে একমাত্র মাঠ হইতে ধরিয়া আনিয়াছেন, হাযেরানে মজলিসের অধিকাংশই সেই শ্রেণীর লোক।

ওয়ায়েয মৌলবী সুধারামী সাহেব।

তিনিই গ্রামের সরদার বা শরিয়তী শাসক।

কয়েক গ্রামের পরবর্তী এক গ্রামে তিনি বাস করেন। তিনি সেখানকার পুরাতন বাসেন্দা নহেন। তাঁহার জন্মস্থান সুধারাম। তারও আগে তাঁহার পূর্বপুরুষরা পশ্চিম হইতে তথায় তশ্রিফ্ আনেন।

দীনি-এলেম হাসেল করিলে তার যাকাৎ দিতে হয় শরা জারি করিয়া। এই সুধারামী সাহেব শরা জারির উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে এক শুভ মুহূর্তে পদার্পণ করেন।

কোথাও দীর্ঘদিন থাকিতে গেলে তথায় বিবাহ করা সুন্নত। তা না হইলে শহওয়াৎ গালেব হয় এবং নফ্সে-আম্মারা দেহের মধ্যে শয়তানি ওয়াসওয়াসা ঢালিয়া দেয়।

তাই সুধারামী সাহেব কেবল সুন্নতের ইযযত রক্ষা ও শয়তানের বদ্মায়েসির রাস্তা বন্ধ করিবার জন্য ঐ গ্রামের পুত্রহীন এক গৃহস্থের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন।

তথাপি দেশের দুই বিবির প্রতি তিনি কদাচ অবহেলা করেন না। শরিয়তের ঠিক ঠিক ব্যবস্থা মতো যথারীতি তাঁহাদের খোরপোষ যোগাইয়া থাকেন এবং সময় পাইলে বৎসরে এক-আধবার দেশেও গিয়া থাকেন।

হাদিস-কোরআনে লাসানি কাবেলিয়ৎ থাকার দরুন তিনি অল্পকাল মধ্যেই পার্শ্ববর্তী তিন-চারিখানা গ্রামের সরদারি দখল করিয়াছেন।

প্রথম-প্রথম কয়েকখানা গ্রাম বাহাস করিয়াই জিতিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী মৌলবী (সুধারামী সাহেবের মতে মুনশী) গরিবুল্লাহ্‌র গোয়ার্তুমিতে শেষ কয়েকটি গ্রাম দখল করিতে হাদিস কোর্আন রাখিয়া লাঠি-সোটার ও আদালতের সাহায্য লইতে হইয়াছিল।

সে-সব নিতান্ত পুরান কথা।

ইহার পরে গরীবুল্লাহ সাহেব ও সুধারামী সাহেবের মধ্যে একটা রফা হইয়া গিয়াছে। এই রফার ফলেই সুধারামী সাহেব এই সমস্ত গ্রামের সরদারি ভোগ করিতেছেন।

তবে গরীবুল্লাহ লোক মোতেবর নহেন বলিয়া তিনি ভিতরে ভিতরে এই সমস্ত গ্রামের লোককে গোমরাহ্ করিয়া ফেলিতে যাতে না পারেন, সুধারামী সাহেবের সেদিকে নজর আছে।

গ্রামের সকলে বিশেষ করিয়া অবস্থাশালী সকলে, উপস্থিত আছে কি না, তা নিজে জনে-জনে নাম ডাকিয়া পরীক্ষা করিয়া মৌলবী সাহেব ওয়াজ শুরু করিলেন। মোখ্রেজ ও তালাফ্ফুযের ইয্যৎ রক্ষা করিয়া, আইন-গাইন কাফের কারী উচ্চারণ করিয়া এবং হায়-হুত্তির উচ্চারণ ঠিক হল্কম হইতে বাহির করিয়া তিনি মিস্রী এল্হানে যথাক্রমে আউযু, বিস্মিল্লাহ ও সূরা ফাতেহা পড়িলেন।

হাযেরানে-মজলিসের কাহারও পক্ষে তাঁহার কথা না শুনিবার কোনও সুবিধা থাকিল না; কারণ হাযেরানে-মজলিসের সুবিধার জন্যই হউক, কিম্বা অন্দরে যে, মুরগী পাক হইতেছিল তার খুশবু নাকে প্রবেশ করাতে উৎসাহিত হইয়াই হউক, তিনি কালামে-পাক এত বুলন্দ আওয়াজে পড়িলেন যে, উহা শুনিবার জন্য গ্রামের অনেকেরই পক্ষে কষ্ট করিয়া বাড়ি ছাড়িয়া আসার কোন প্রয়োজন ছিল না।

তিনি আউযু ও বিসমিল্লাহ শরিফের টিকাটিপ্পনি ও সূরা ফাতেহার তফসির বয়ান করিবার পর আরেকবার গলা সাফ করিয়া "ওইযা কোরিয়াল কুরআনু ফাসতামেউ" আখেরতক পাঠ করিলেন এবং উহার শানে-নযুলও খোলাসা বয়ান করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি আল্লাহ-পাকের বহুৎ বহুৎ তারিফ, কোরআন-মজিদ ও ফোরকানে-হামিদের বরহকত্ব, উহা শ্রবণ করিবার সোওয়াবের বেশুমারত্ব, সোওয়াবের বদলা যে বেহেশত পাওয়া যাইবে তার হুর ও গেলমানদের সুরত ও চান্দের সুরতের পার্থক্য, বেহেশতের শারাবন-তহুরার মিষ্টতা ও মধুর মিষ্টতার আনুপাতিক হিসাব ওগায়রা বয়ান করিলেন এবং তাঁহার ওয়াজ চুপ করিয়া শুনিলেই যে সমস্ত পাওয়া যাইবে, সে সম্বন্ধে হাযেরানে মজলিসকে পুনঃপুনঃ গ্যারান্টি দান করিলেন।

কারণ তিনি তাঁহার ওয়াজে হাদিস-কোরআনের বাহিরের এক আলফাযও এস্তেমাল করিতেন না।

এই উপলক্ষে তিনি মনগড়া হাদিস ব্যাখ্যাকারী আলেম নামধারী জাহেলদের ফেরেব হইতে পরহেয থাকিবার জন্য হাযেরানে-মজলিসকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিলেন এবং মুন্সী গরীবুল্লাহও যে এই শ্রেণীর লোক; নিতান্ত প্রসঙ্গক্রমে তিনি তারও দু'একটা চাক্ষুষ প্রমাণ উপস্থিত করিয়া রসিকতা করিলেন। সকলেই হাসিয়া সে-রসিকতার মর্যাদা রক্ষা করিল।

ভূমিকাতে ঘন্টা দেড়েক কাবার হইল।

বাড়িওয়ালা পিছন হইতে বলিয়া গেলেন ঃ খানা তৈয়ার।

সুতরাং মৌলবী সাহেব ভূমিকা হইতে সটান উপসংহারে চলিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন যে, সময় কম বলিয়া আজ কেবল মুখ্তসর-মুখ্তসর বয়ান করিলেন। আল্লাহর কালাম খোলাসা বয়ান করিতে অনেক সময়ের দরকার। কিন্তু মানুষ দুনিয়ার খেয়ালে

এতই মশগুল হইয়া গিয়াছে যে দীনের কথা শোনার কাজে তাহারা মোটেই সময় ব্যয় করতে চায় না।

যাহারা মৌলবী সাহেবের সারবান্ ওয়াযের গুরুপাকত্ব হজম করিতে না পারিয়া ইতিমধ্যে উঠিবার জন্য উসপিস করিতেছিল, লজ্জা পাইয়া তাহারাও আবার ভাল হইয়া বসিল।

মৌলবী সাহেব বলিয়া যাইতে লাগিলেন ঃ হাদিস-কোরআনে কেয়ামতের যে সমস্ত আলামৎ বয়ান করা হইয়াছে, আজকালকার জমানার হালচাল তার সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলিয়া যাইতেছে। আজকার মুসলমানরা আখেরাত ছাড়িয়া দুনিয়ার আয়েশ-আরামের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দুনিয়ার সুখ মুসলমানের জন্য হারাম একথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। হযরত পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পেটে পাথর বাঁধিয়া দিন কাটাইয়াছেন, আজ তাঁহার উম্মত আমরা কিনা দুনিয়ার ফেকেরে মসরুফ আছি।

এই পর্যন্ত বলিয়া মৌলবী সাহেব কাঁদিবার মতো মুখ ভঙ্গি করিয়া কোর্তার খুঁটে চোখ মুছিয়া লইলেন।

হাযেরানে-মজলিসেরও অনেকের চক্ষু ছল্‌ছল্‌ হইয়া আসিল। মৌলবী সাহেব আবার বলিতে লাগিলেন ঃ আমরা ধন-দৌলৎ পাইয়া শয়তানের ওস্‌ওয়াসায় খোদাকে ভুলিয়া গিয়াছি। বড়ই আফসোসের কথা, ধন-দৌলতের মায়া আমরা কাটাইতে পারি না। নেহায়েত শরমের কথা, আমরা আজ যাকাত-খয়রাত দেই না। আলেমের হক আদায় করি না। নায়েবে-নবী, হাদিয়ে উম্মত চেরাগে দিন আলেম ফাযেলের খেদমত করি না। দিনের চেরাগ আলেম ফাযেলেরা দুনিয়ার চিন্তা হইতে ফারেগ হইতে না পারিলে তাঁহারা এস্‌লামের রওনক বৃদ্ধি করিবেন কেমন করিয়া? মুসলমানদের যে আজ তঙ্গদস্তি হইতেছে না, তার কারণ ইহারা আলেম-সমাজের হক আদায় করিতেছে না। আলেম সমাজকে যদি পেটের চিন্তা করিতে হয়, তবে আর এসলামের চেরাগ জ্বালাইয়া রাখিবে কাহারা? এইজন্য হাদিস শরীফে আসিয়াছে ঃ নায়েবে-রসুলদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সমাজের।

এখানে মৌলবী সাহেব নিজের আর্থিক দুরবস্থার কথা তুলিলেন।

কিভাবে এক দুষ্টের পাল্লায় পড়িয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাটের কারবার করিতে গিয়া তিনি দেনাগ্রস্ত হইয়া পরিয়াছেন। কিভাবে বেদিন কাফের মহাজন মাসে মাসে সুদের টাকা আদায় করিয়া নিতেছে, কিভাবে তিনি ছেলেমেয়েদের লইয়া মহাবিপদে পড়িয়াছেন, কিভাবে তিনি দেশের বিবি ও ছেলেমেয়েদের জন্য দেড় বৎসর যাবৎ একটা পয়সাও পাঠাইতে পারিতেছেন না; সমস্ত বিষয় ছল ছল চোখে বয়ান করিলেন।

এবার সত্য সত্যই তাঁহার চোখে পানি দেখা দিল। তিনি বাম হাতের পিঠ দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিলেন। আলেম ফাযেলকে খোদা বিপদে ফেলেন মুসলমানদের ঈমান পরীক্ষার জন্য। মৌলবী সাহেবকে অর্থ সাহায্য করিয়া এই পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করিলেন।

এতক্ষণ শ্রোতৃমণ্ডলী কোনরূপে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

এইবার কেহ কাহারও মুখের দিকে না চাহিয়া সকলেই উঠিয়া পড়িল। কেহ-কেহ অতিসন্তর্পণে রওয়ানার উদ্যোগ করিল।

মৌলবী সাহেব পাশে-দাঁড়ানো বাড়িওয়ালা মাতব্বর সাহেবের দিকে ছল-ছলে নেত্রে চাহিলেন।

মাতব্বর সাহেব উচ্চস্বরে বলিলেন ঃ মৌলবী সাহেবের এখনও খাওয়া হয় নাই। আপনারা কে কি দিবেন, একটু শীগগির শীগগির দিয়া যাবেন।

কথা শেষ করিয়া মাতব্বর সাহেব দেখিলেন ঃ বাড়ি যাওয়ার আয়োজনে সবাই এত ব্যস্ত যে, কেহ তাঁহার কথা শুনিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না।

তখন তিনি অপেক্ষাকৃত উঁচু গলায় হুকুমের সুরে বলিলেন ঃ যাবেন না মিয়ারা। মৌলবী সাহেবের একটা ব্যবস্থা না করে কেউ যাবেন না।

প্রধান প্রধান অনেকেই ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইল। কিন্তু টাকা-পয়সা দানের একটা ফ্যাসাদে পড়িয়া অনেকেরই মুখ একটু ভার বোধ হইতে লাগিল।

অবশেষে এক এক করিয়া প্রায় সকলেই বলিল যে, তার টাকার আজকাল বড় টানাটানি। মাতব্বর সাহেবই তার চাঁদাটা চালাইয়া দিন।

দানের টাকা চালাইয়া দিলে যে তা আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না, মাতব্বর সাহেবের সে অভিজ্ঞতা ছিল।

তিনি বলিলেন ঃ নূতন করে চাঁদা আদায় করায় হাঙ্গামা অনেক। লোকের সত্যই আজকাল বড্ড টানাটানি। আমি বলি কি, কোরবানির চামড়ার যে-টাকা আমার নিকট আমানত আছে, সেই টাকাটাই মৌলবী সাবকে দিয়ে দেওয়া যাক।

ত্রিপলি-যুদ্ধরত তুরস্ককে সাহায্য করিবার জন্য মাত্র তিন চার দিন পূর্বে যে ঐ টাকা দান করিবার ওয়াদা করা হইয়াছে, এবং সে টাকা আদায় করিবার জন্য যে আজকালই লোক আসিতে পারে, মৌলবী সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া মাতব্বর সাহেব পর্যন্ত উপস্থিত সকলেরই সে কথা মনে পড়িয়া গেল।

কিন্তু ঐ প্রতিশ্রুতি উপস্থিত সকলেরই স্বার্থের প্রতিকূল বলিয়া কেহ সে কথার উল্লেখ করিলেন না।

ঐ টাকা মৌলবী সাহেবকে দেওয়াই সাব্যস্ত হইল।

মৌলবী সাহেবের মুখের গাম্ভীর্য বাড়িয়া গেল।

তিনি এতক্ষণে জোর গলায় বলিলেন ঃ মোনাজাত না করিয়া মজলিস ভাঙ্গিতে নাই, কারণ ওয়াযের মজলিসে ফেরেশতা আসে।

এই বলিয়া তিনি উচ্চস্বরে উর্দুতে উপস্থিত সকলের, তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের, তামাম জাহানের মুসলমান যিন্দা ও মুর্দা মরদ ও আওরতের, বিশেষ করিয়া হযরত ইব্রাহিম মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হেওসাল্লামের আল-আওলাদের উপর আহ্সানি পৌঁছাইবার জন্য ও তাঁহাদের প্রত্যেকের কবর মগ্রেব হইতে মশ্রেক পর্যন্ত কুশাদা রওশন করিবার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট বহুৎ বহুৎ সুপারিশ করিয়া এবং সমস্ত মো'মেন মুসলমানকে দুনিয়াবী ধন-দৌলতের ফেরেব হইতে হামেশা দূরে রাখিবার জন্য খোদাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া মোনাজাতের উপসংহার করিলেন। উপস্থিত সকলে পিছন হইতে "আমিন। ইয়া রাব্বেল আলামিন!" বলিয়া তাহার সুপারিশের গোড়া শক্ত করিয়া দিল।

খানা আসিল।

মৌলবী সাহেব খাইতে বসিলেন।

চাঁদা সম্বন্ধে উপরোক্ত মীমাংসা হইবার পূর্বে কামকাজের তাড়নায় যাহাদের এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিবার জো ছিল না, তাহারা এখন নিরুদ্বেগে গল্পগোযারি ও মাতব্বর সাহেবের তামাক ধ্বংস করিতে লাগিল।

মৌলবী সাহেবের খাওয়া আধা-আধি হইয়াছিল। হঠাৎ অদূরে বহু কণ্ঠের মিলিত 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি শোনা গেল। মৌলবী সাহেব ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন।

উপস্থিত সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

মৌলবী সাহেব কথার জবাব দিবার ফুরসৎ হইল না। প্রায় জন কুড়ি পঁচিশেক ছেলেপিলে এক যুবকের নেতৃত্বে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সকলের হাতে চাঁদ তারা মার্কা নিশান, গলায়-কোমরে প্যাঁচ দেওয়া সবুজ রঙের ব্যাজ!

ইহারা ভলান্টিয়ার। পাশের গ্রামের মাইনর স্কুলের ছাত্র। যুদ্ধরত তুরস্কের জন্য চাঁদা আদায় করা এবং তুর্কীটুপি পোড়ানো ইহাদের কাজ।

স্কুলের জনৈক যুবক শিক্ষক ইহাদের নেতা।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই 'আসসালামু আলায়কুম' বলিয়া নেতা মাস্টার সাহেব একটি টুলে বসিয়া পড়িলেন।

ছেলেরা সব জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল কেহ-কেহ ছেলেদেরও বসিতে বলিল। কিন্তু বসিবার কোন স্থান না থাকায় ছেলেরা দাঁড়াইয়া থাকিল।

মাস্টার সাহেব চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ থাক্, থাক্, ওদের আর বসতে হবে না। কতক্ষণেরই বা কাজ!

ছেলেরা বসিতে না পারিয়া স্বভাবতই কোন কাজ খুঁজিতে লাগিল।

মৌলবী সাহেবের পাশে পাটির উপর তাঁহার পাগড়ি পড়িয়াছিল। সেই পাগড়ির ভিতর হইতে একটি টুপির অর্ধেক বাহির হইয়াছিল।

টুপিটি এককালে লাল রঙেরই ছিল; কিন্তু আজকাল তার যে রঙ হইয়াছে, তাকে কোন মতেই লাল বলা চলে না।

তথাপি উহা যে তুর্কীটুপি—অন্ততঃ এককালে তাই ছিল, তাহা বুঝতে দুষ্ট ছেলেদের আর বাকি রহিল না। দুই-তিনজন এক সঙ্গে লম্ফ প্রদান পূর্বক সেই টুপির উপর পড়িল এবং কাড়াকাড়ি করিতে-করিতে তারা আগুন খুঁজিতে লাগিল।

তামাক খাইবার জন্য বিচালির বেণীতে আগুন রাখা হইয়াছিল। মুহূর্তে টুপিটি তারা সেই বেণীতে গুঁজিয়া ধরিল।

মৌলবী সাহেব 'হেই, কি কর' বলিয়া এঁটো হাতেই এক লাফে ছেলেদের উপর পতিত হইলেন এবং তাহাদিগকে সজোরে ধাক্কা মারিয়া সরাইয়া দিয়া টুপি উদ্ধার করিলেন।

বহুদিন ধরিয়া মৌলবী সাহেবের বাবরী চুল হইতে পরের বাড়িতে দেওয়া খাঁটি সরিষার তেল চুষিয়া-চুষিয়া টুপিটি এমন সরস হইয়াছিল যে নিংড়াইলে বেশ দুই-চার ফোঁটা তেল বাহির হইত। কাজেই উহাতে বেণীর আগুন অত তাড়াতাড়ি ধরিতে পারে

নাই। মৌলবী সাহেব মুখে ছেলেদের 'বেআদব, বেতমিয, রযিল, আতরাফ, বলিয়া গাল দিতে দিতে ঝুটা হাতে টুপি সাফ করিতে গিয়া উহাকে কাল ও হলুদ রঙে রঞ্জিত করিয়া ফেলিলেন।

উপস্থিত সকলে ব্যাপারটা আকস্মিকতায় হতভম্ভ হইয়া গেলেও ছেলেদের উদ্দেশ্য সকলেই বুঝিতে পারিল। তাই মাস্টার সাহেব ছেলেদের তম্বিহ্ করিতে গেলে দুই-একজন আস্তে-আস্তে বলিল ঃ ছেলেদের আর দোষ কি?

মাস্টার সাহেব ছেলেদের পক্ষ হইতে মৌলবী সাহেবের নিকট মাফ চাহিয়া বলিলেনঃ ছেলেরা তাদের নেতৃস্থানীয় লোকের আদেশেই তুর্কি টুপি পোড়াচ্ছে। কেউ তাতে রাগ করে না। আপনি আলেম, আপনিও রাগ করবেন না, এই ভরসাতেই তারা আপনার টুপিতে হাত দিয়েছিল।

মৌলবী সাহেব তখনও রাগে ফোঁপাইতেছিলেন। তিনি মুখ ভ্যাঙচাইয়া বলিলেন ঃ না, রাগ করব না! ছোকরারা বে-আদবি করবে আমি রাগ করব না। আপনিই বা কেমন ধারা মাস্টার? আপনার ছাত্ররা একজন আলেমের সঙ্গে বে-আদবি করল, আর আপনি তাদেরই তরফে ওকালতি করছেন।

মাস্টার সাহেব বলিলেন ঃ কাজটা যেভাবে করেছে; সেটা সত্যি দোষের, কিন্তু যে কাজটা করতে ওরা যাচ্ছিল, তার আমরা সমর্থন করি।

মৌলবী সাহেব গর্জন করিয়া উঠিলেন ঃ টুপি পোড়ান আপনি সমর্থন করেন?

মাস্টার সাহেব শুদ্ধ করিয়া দিলেন ঃ তুর্কী টুপি পোড়ান।

তুর্কী-ফুর্কী আমি বুঝি না। টুপি তো? যে টুপি মাথায় দেওয়া হযরতের সুন্নত, যে টুপি মাথায় না দিলে নামাজ হয় না, সেই টুপি আপনারা পুড়িয়ে ফেলেছেন? এসলামের এ বে-ইজ্জতি আপনারা মুসলমান হয়ে করেছেন? ইংরাজি পড়লেই এমন হবে, তা আলেমরা আগেই জানত।

মাস্টার হাসিয়া বলিলেন ঃ আমরা এসলামের ইজ্জত রক্ষার জন্যই তুর্কী টুপি পোড়াচ্ছি। অন্য টুপি আমরা পোড়াতে যাব কেন?

—তুর্কী টুপি কি অপরাধ করেছে? এ টুপি ত রোমের বাদশার হুকুমে তৈরি হচ্ছে।

মাস্টার সাহেব হাসিয়া বলিলেন ঃ এটা আপনাদের ভুল ধারণা। তুর্কী টুপি নামেই তুর্কী। আসলে এ তৈয়ার হয় খ্রিস্টানদের দেশে। সেই দেশের নাম ইটালি। এই ইটালি দেশ আজকাল রোমের সুলতান আমাদের খলিফার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। সেইজন্য সে দেশের তৈরি টুপি আমরা বয়কট করেছি।

কথোপকথনে মৌলবী সাহেবের খাওয়া শেষ হইয়াছিল, সুতরাং রাগও কমিয়া আসিয়াছিল। তিনি এইবার খেয়াল করিতে-করিতে অবিশ্বাসের উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেনঃ রোমের সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ইটওয়ালি না কে, এই কেস্সায় আপনারা এতবার করছেন? কে বলেছে এই কথাকে এনেছে এই খবর? কে গিয়েছিল রোমে?

—বলিয়া বিজয়গর্বদীপ্ত মুখে তিনি উপস্থিত প্রত্যেকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত

করিলেন এবং হাসিতে-হাসিতে সম্মুখস্থ পানদান হইতে একটা পান গালে পুড়িয়া আঙ্গুলের ডগায় চুন লইয়া নিপুণতার সহিত শাদাপাতা ছিঁড়িতে লাগিলেন।

মাস্টার যুবক মানুষ। মৌলবী সাহেবের এই অমার্জনীয় অজ্ঞতায় তাঁহার রাগ হইল। তিনি কিঞ্চিৎ রাগত-স্বরে বলিলেন ঃ আপনি তা হলে লড়াইর কথাটাই অবিশ্বাস করেন?

মৌলবী সাহেব ফিক্ করিয়া ঘরের বেড়ায় একগাল পিক্ ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত জয়ের গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন ঃ অবিশ্বাস করব না? রোমের সুলতানের বিরুদ্ধে যে ইটওয়ালি না কে লড়াই করছে, আপনি বলতে পারেন, তার সোলতানৎ কত বড়? তার কয় লাখ সিপাই আছে?

মাস্টার বলিলেন তা, তার রাজ্য খুব বড় নয় বটে, কিন্তু ইংরাজ তাকে সাহায্য করছে।

মৌলবী সাহেব মাস্টারের অজ্ঞতায় এবার রাগিয়া গেলেন। বলিলেন ঃ ইংরাজ রোমের সুলতানের দুশ্‌মনকে সাহায্য করছে, এও আপনারা বিশ্বাস করেছেন? ইংরাজি পড়ে আপনাদের ঈমান-আমান সব গেছে, যাক, আক্কেলের মাথাও কি আপনারা খেয়েছেন? প্রজা হয়ে মনিবের বিরুদ্ধে লড়াই করবে ইংরাজ?

মাস্টার অবাক হইয়া বলিলেন ঃ কে কার প্রজা? কে কার মনিব?

মৌলবী সাহেব বলিলেন ঃ বাহ্। কেন, ইংরাজ রোমের সুলতানের প্রজা নয়? এটাও জানেন না? কি লেখাপড়া শিখেছেন তবে?

মাস্টার এবারে হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন ঃ ইংরাজ রোমের সুলতানের প্রজা নয়, সুলতানের চেয়ে ঢের বড় বাদশাহ।

মৌলবী সাহেব কানে আঙ্গুল দিয়া "আসতাগ্ ফেরুল্লাহ্" পড়িতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন ঃ আপনি হাদিস-কোরআনের খেলাফ কথা বলতে শুরু করেছেন। আপনার সঙ্গে বাহাস করে আমি গোনাহগার হতে চাই না।

বলিয়া তিনি সমবেত লোকজনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন ঃ হাদিস শরীফে এসেছে ঃ তামাম জাহানের মধ্যে রোমের সোলতানৎ সকলের চেয়ে বড় মুকুল। কোরআন-পাকেও খোদাতালা রোমের সুলতানের বয়ান করেছেন। আর আজ কিনা ইংরাজি-পড়া লোকের কাছে শুনতে পাই ইংরাজদের বাদশাহি রোমের বাদশাহির চেয়েও বড়। হাদিস শরীফে রোমের সুলতানকে শারেজাহানের বাদশাহ বলা হয়েছে। ইংরাজরা কি জাহানের বাইরে বাস করে? কোরআনের কথা কি ঝুট হয়ে গেল? নাউযুবিল্লাহে-মিন যালেক।

মাস্টার দেখিলেন ঃ ইহার সঙ্গে তর্ক করিয়া জিতিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাই তিনি আর কোন কথা না বলিয়া বাড়িওয়ালা মাতব্বর সাহেবের দিকে ফিরিয়া বলিলেন ঃ এ গ্রাম থেকে যে চাঁদার ওয়াদা করেছিলেন, তা আদায় করতেই আমরা এসেছি।

মাতব্বর সাহেব কোন কথা বলিবার আগেই মৌলবী সাহেব যেন কিছুই জানেন না এইভাবে জিজ্ঞেস করিলেন ঃ কিসের চাঁদা?

মাস্টার কোন জবাব দিলেন না। মাতব্বর বলিলেন ঃ সেই যে রোমের সুলতানের যুদ্ধের সাহায্য।

মৌলবী সাহেব আবার চিৎকার করিলেন ঃ কোথায় যুদ্ধ যে তার সাহায্য? কার ঘাড়ে দশটা মাথা যে রোমের সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াই করবে? আর লড়াই বাধলেই যে সুলতান হিন্দুস্থানের সাহায্য চাইবেন, একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? যে রোমের সুলতানের মাল-মাত্তার কথা কোরআন-হাদীসে বয়ান করা হয়েছে, হিরা, ইয়াকুৎ, লাল, জওয়াহের যাঁর খাযাঞ্চিখানা বোঝাই, তিনি কিনা যুদ্ধের জন্য ভিক্ষা চাইতে এসেছেন এই হিন্দুস্থানে—এই দারুল হরবে! যত সব মতলববাজ লোক টাকা রোজগারের এ-একটা ফন্দি বের করেছে। নইলে রোমের বাদশাহ-সাত মুলুকের যিনি বাদশাহ—তিনি এলেন ভিক্ষা করতে, এটাও কি একটা কথা হল? যান যান, সাব এ গ্রামের সকলেই উম্মি লোক নয়। এখানে ও-সব ঠকামি চলবে না।

মাস্টারের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। তিনি মৌলবী সাহেবের দিকে চোখ গরম করিয়া বলিলেন ঃ হয়েছে, আপনার আর বক্তৃতা করতে হবে না।

মাতব্বরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন ঃ কই মিয়াসাব চাঁদাটা দিয়ে দিন।

মাতব্বর আমতা আম্‌তা করিয়া বলিলেন ঃ দিব বই কি! তবে কিনা লড়াই-টরাইর কথাই যদি মিথ্যা হয়, তবে আর চাঁদা দিয়ে কি হবে?

মৌলবী সাহেব মাতব্বরের কথার মাঝখানে বলিলেন ঃ মিথ্যা মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা! সব জোয়াচুরি!

মাস্টার আরও উষ্ণ হইয়া বলিলেন ঃ আপনারা যে ওয়াদা করেছিলেন?

মাতব্বর সাহেব কি বলিতে যাইতেছিলেন। মৌলবী সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন ঃ লড়াইর কথা যে ডাহা মিথ্যা, তখন ত এরা সে কথা জানত না। এ-রকম ওয়াদা খেলাফে দোষ নাই।

মাস্টার মৌলবীর দিকে একটা ক্রুর কটাক্ষ করিয়া মাতব্বরের দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ তবে কি আপনারা চাঁদা দেবেন না?

মাতব্বর সাহেব ঘাড় চুলকাইয়া বলিলেন ঃ লড়াই-টড়াই কথা যখন সব মিথ্যা, তখন—

বাধা দিয়া মাস্টার উপস্থিত অন্যান্য সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ আপনাদেরও কি তাই মত?

রোমের সুলতান বড় কি ইংরাজ বড়, যুদ্ধ সত্যই লাগিয়াছে কি লাগে নাই, এসব কথা তাহারা মোটেই ভাবিতেছিল না। তাহারা ভাবিতেছিল ঃ কোরবানির চামড়ার টাকাটা রোমের সুলতানকে দিয়া দিলে মৌলবী সাহেবের জন্য নতুন করিয়া চাঁদা দিতে হইবে। তাই তাহারা মাস্টারের প্রশ্নে প্রায় এক বাক্যে উত্তর দিল ঃ আমাদের মাতব্বর সাব যা বলেছেন—

মাস্টার আর শুনিলেন না। চলে এসো—বলিয়া ছাত্রদের ডাকিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ছাত্রগণ সারি দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া চিৎকার করিল ঃ আল্লাহু আকবর।

অহরহ-আল্লাহ্‌র-নামাজ-যেকেরে-অভ্যস্ত মৌলবী সাহেবের কানে ছেলেদের এ আল্লাহু-আকবর-ধ্বনি বিষাক্ত ছুরিকাঘাতের মতো বিদ্ধ হইল।

## তিন

সেদিন গ্রামের একটি মাতব্বর লোক মারা গিয়াছেন।

আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী অনেক লোক জানাজা পড়িতে আসিয়াছে।

আত্মীয়-স্বজনদের মাঝখানে বহুদিনের-অব্যবহৃত-কাল-সাটিনের চওগা-পরা মৌলবী গরীবুল্লাহ সাহেবকেও দেখা গেল।

মৌলবী সুধারামী সাহেব সেখানে পৌঁছিয়া গরীবুল্লাহ সাহেবকে দেখিয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেলেন এবং দন্তপূর্ণ সুরে "আস্‌সালামু আলায়কুম" বলিয়া গরীবুল্লাহ সাহেবের প্রতি একটা ক্রুর দৃষ্টিপাত করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। আসন গ্রহণ করিয়াই তিনি খুব হয়বতের সঙ্গে চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। তিনি দেখিলেন ঃ জনতা চার-পাঁচ জনের ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কি যেন কানাকানি করিতেছে। মুহূর্তে তাঁহার মুখের ভাব বদলিয়া গেল। তিনি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়িলেন।

ক্রমে তিনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন ঃ সব তৈয়ার ত? তবে আর দেরি কিসের? লাশ নিয়ে বসে থাকা বহুত গোনার কাজ। হযরত তিনটা কাজের প্রতি বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। প্রথমতঃ স্ত্রীলোক বিধবা হলে জলদি তার নিকাহ দেওয়া, নামাজের ওয়াক্ত হলে জলদি নামাজ আদায় করা এবং মাইয়েৎকে ফওরান দাফন করা। এই তিন কাজের মধ্যে আবার হযরত মাইয়েৎ সম্বন্ধেই সবচেয়ে বেশি তাগিদ দিয়েছেন। কারণ লাশ যতক্ষণ কবরস্থ না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর আযাব হতে থাকে।

হযরতের এই তাগিদের কথা, বিশেষ করিয়া মৃত ব্যক্তির দেহের উপর আযাব হইতেছে শুনিয়া মাইয়েতের পুত্রেরা ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মেয়েলোকের কান্নাকাটি ও শোরগোলের মধ্যে লাশ বাড়ির বাহির করা হইল।

লাশ সামনে লইয়া সকলকে কাতার করিয়া দাঁড়াইবার জন্য মৌলবী সুধারামী সাহেব আদেশ করিলেন।

অনেকে দাঁড়াইল, অনেকে দাঁড়াইল না।

মৌলবী সাহেব অতিষ্ঠ হইয়া ধমকের সুরে তাঁহার আদেশের পুনরাবৃত্তি করিলেন।

গরীবুল্লাহ সাহেবের পুনঃ পুনঃ ইশারায় একজন বলিল ঃ আগে জানতে চাই, জানাজা পড়া হবে কিভাবে?

সুধারামী সাহেব এই আশঙ্কাই করিতেছিলেন। তিনি কথা না বুঝিবার ভান করিয়া বলিলেন ঃ কিভাবে কি রকম? এ সওয়ালের মানে কি? শরিয়তের হুকুম-মতেই জানাজা পড়া হবে।

প্রশ্নকর্তা গরিবুল্লাহ সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিল ঃ এইবার বলুন মৌলবী সাহেব আপনার কি বলবার আছে।

সকলের সমবেত দৃষ্টি গরীবুল্লাহ সাহেবের উপর পতিত হইল।

তিনি বলিলেন ঃ শরিয়তের হুকুমটা কারও বাপের ঘরের কথা নয়। সাহেবান

আপনারা বাপদাদার আমল থেকে মাইয়েতের সিনা বরাবর দাঁড়িয়ে জানাযা পড়ে আসছেন। আমি শুনতে পেলাম, আপনাদের এমাম মুনশী সুধারামী সাব নূতন শরিয়ত বের করেছেন। তিনি নাকি মাইয়েতের শির বরাবর দাড়িয়ে জানাযা পড়বার ফতোয়া দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র কালাম, হযরত রসূলে করীমের হাদিস কি নূতন হচ্ছে? আল্লাহ্-রসূলের নামে যারা এইভাবে তামাশা করে, তারা যদি আলেম, তবে জাহেল কে?

সুধারামী সাহেব চটিয়া রাগে কাঁপিতেছিলেন ঃ গরীবুল্লাহ সাহেবের কথায় বাধা দিয়া কথা বলিবার জন্য দুই-তিনবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু গরীবুল্লাহ সাহেবের গলা তাঁহার গলার চেয়ে বেশ কিছুটা মোটা ছিল বলিয়া তিনি সুবিধা করিয়া উঠতে পারেন নাই। এইবার গরীবুল্লাহ সাহেব চিৎকার করিয়া বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র কালাম ও রসূলে-করিমের হাদিস বদলায় নাই; যে সব জাহেল ওর মানে বুঝতে পারে না, তারাই বলে যে ওর অর্থ বদলান হয়েছে।

গরীবুল্লাহ সাহেবও একথার যথোচিত জবাব দিলেন।

এইভাবে বাহাস শুরু হইল।

উভয় মৌলবী সাহেবেই বুঝিলেন ঃ দু'জনের পক্ষেই লোক আছে; সুতরাং নির্ভয়ে তর্ক চলিতে লাগিল।

তর্কে প্রথম-প্রথম উভয় মৌলবীই পরস্পরকে 'মুনশী সাব' বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন। কিন্তু বাহাস গরম হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এই সম্বোধন 'জাহেল' নাদানে নামিল। কে কতটুকু পড়াশোনা করিয়াছেন, কে কবে মাদ্রাসায় মার খাইয়া পালাইয়াছিলেন আর যান নাই, এসব পুরাতন স্মৃতির দ্বারউদঘাটিত হইতে লাগিল। কে কবে কত টাকা লইয়া একজনের বিবাহিত স্ত্রীকে আরেকজনের সঙ্গে নিকাহ দিয়াছিলেন, গ্রামের অনেক অজ্ঞের-সামনে এই প্রকার অনেক নূতন তথ্যও প্রকাশ পাইতে লাগিল।

ঘন্টার পর ঘন্টা চলিয়া গেল। মজা দেখিবার জন্য ভিড় বাড়িতে লাগিল।

বাপের দেহের উপর আযাব হইতেছে ভয়ে মৃত ব্যক্তির পুত্রেরা অনেক তাগাদা করিল। কিন্তু তাহারা ব্যতীত আর সকলে উৎসাহের বাহাস-শুনিতে লাগিল।

লাশ রৌদ্রের মধ্যে পড়িয়া রহিল।

বেলাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন নায়েবে-নবীদ্বয়ের ক্ষুধাবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন স্বভাবতই তাঁহাদের কথার উষ্ণতাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কিন্তু কেহ হার মানিল না। গরীবুল্লাহ সাহেবের নষ্ট সরদারি পুনরুদ্ধারের এই শেষ চেষ্টা, সুতরাং তিনি হারিতে পারেন না। আল সুধারামী সাহেবের এই যুদ্ধজয়ের উপরই সর্বস্ব নির্ভর করিতেছে, সুতরাং তিনিও হারিতে পারেন না।

অতএব বাহাস চলিতে লাগিল। এ বাহাসের পনর আনাই গালাগালি। হাদিস-কোরআনের বাহাস হইলে এতক্ষণ আর কিছুতে না হইক শ্রোতার অভাবেই বাহাস শেষ হইত। কিন্তু ব্যক্তিগত গালাগালি হাদিস-কোরআন অপেক্ষা অনেক বেশি শ্রুতিমধুর বলিয়া শ্রোতার সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িতে লাগিল। যাহারা কাজের চাপে জানাযা পড়িতে আসিতে পারে নাই, তাহারাও বাহাস শুনিতে আসিল।

বেলা যত উপরের দিকে উঠিতে লাগিল, তার্কিকদ্বয়ের গালাগালিও ততই ধাপে ধাপে পরস্পরের পিতৃপুরুষের ঊর্ধ্বদিকে উঠিতে লাগিল। কার বাপের পেটে এক হরফ খোদার কালাম পড়ে নাই, কার বাপ চাষা ছিল, কার দাদা লবণের দোকানদারি করিত, কার নানা পান বিক্রি করিত, হাদিস-কোরআনের এইসব গভীর তথ্য সম্বন্ধে পরস্পরের জ্ঞানের প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল।

কিন্তু বাক্-যুদ্ধেরও শেষ আছে। উভয়পক্ষ হইতেই গালাগালির গুদাম সাবাড় হইয়া আসিল।

সুধারামী সাহেব যুদ্ধের নূতন অধ্যায় শুরু করিলেন। তিনি 'তবে রে শালা' বলিয়া এক পা হইতে দেলওয়ারী জুতা খুলিয়া গরীবুল্লাহ সাহেবের দিকে সাজোরে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু গরীবুল্লাহ সাহেবের গায়ে না লাগিয়া উহা দূরে গিয়া পড়িল।

জুতাটা কুড়াইয়া আনিবার জন্য যেই সুধারামী সাহেব সেদিকে ছুটিয়া গেলেন, অমনি গরীবুল্লাহ সাহেব এক লাফে লাশের সামনে এমামের জায়গায় গিয়া দাঁড়াইলেন এবং চিৎকার করিয়া কহিলেন ঃ হাদিস-কোরআনকে বেদ্ আতীদের হাত থেকে রক্ষা করে যাঁরা সওয়াব হাসেল করতে চান, তাঁরা আসুন-মাইয়েৎ ফেলে রেখে আর গোনাহ করিতে পারব না।

উপস্থিত লোকের বেশির ভাগ কাতার করিয়া দাঁড়াইল। গরীবুল্লাহ সাহেব তাড়াতাড়ি 'আল্লাহু-আকবর' বলিয়া জানাজায় দাঁড়াইয়া গেলেন।

সুধারামী সাহেব জুতা কুড়াইয়া পায়ে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই না দেখিয়া তিনি এক জুতা হাতে লইয়াই ছুটিয়া আসিলেন এবং এক ধাক্কায় গরীবুল্লাহ সাহেবকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আল্লাহু-আকবর বলিয়া নিজেই এমামতিতে দাঁড়াইলেন।



তিনি এক জুতা হাতে লইয়াই ছুটিয়া আসিলেন এবং...

গরীবুল্লাহ্ সাহেবও উঠিয়া সুধারামীকে এক ধাক্কা মারিলেন।

হাতাহাতি লাগিয়া গেল। সমবেত লোকেরা বহু কষ্টে জেহাদরত নায়েবে-নবীদ্বয়কে পরস্পরের বজ্রমুষ্টি হইতে মুক্ত করিল!

একটি উম্মিলোক মন্তব্য করিল ঃ আলেমদের মধ্যে এইরূপ হাতাহাতি দেখতে বড়ই খারাপ।

জবাবে সুধারামী সাহেব বলিলেন ঃ হাদিসের এক-একটি হরফের সত্যতা বুঝাবার জন্য কত বড় বড় মোজ্তাহেদ মোহাদ্দেস উম্মরভর এত এজ্তেহাদ করেছেন; কোরআানের পবিত্রতা রক্ষার জন্য কত মোজাহেদ জান নেসার করেছেন, আর আমরা হাতাহাতি করেই কি এমন অন্যায় করেছি? হাদিস-কোরআন যে আমাদের জানের কতটা, তোমরা উম্মিলোক তা বুঝবে না।

সকলে শুনিয়া আশ্চর্য হইল, গরীবুল্লাহ্ সাহেব তাঁহারা বিশৃঙ্খল কাপড় ও দাড়ি বিন্যস্ত করিতে করিতে সায় দিলেন ঃ ঠিক কথা।

মৃত ব্যক্তির পুত্ররা বিরক্ত হইয়াছিলেন।

এইবার বড়পুত্র কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল ঃ আপনারা হাদিসের মসলা পরে ঠিক করবেন, আগে আমার মরা বাপকে গোর দিতে দিন।

প্রায় সকলেই বলিল ঃ তাই ত, লাশ আর ফেলে রাখা যায় না।

কিন্তু এমাম শির বরাবর কি সিনা বরাবর দাঁড়াইবেন; তা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত জানাযাও ত পড়া যায় না।

গ্রামের মাতব্বর সাহেব বলিলেন ঃ দুই মৌলবী সাহেবের একজন আজকার জন্য জিদ ত্যাগ করুন। আজ একজনের মতেই জানাযা পড়া হয়ে যাক, পরে বাহাসের মহাফেল করে এই মসলা ঠিক করা হবে।

উভয় মৌলবীই বলিলেন ঃ ইহা তাহাদের জিদও নয়, তাহাদের ঘরের কথাও নয়; হাদিস-কোরানের কথা নিয়া আপোস করা যাইতে পারে না।

সুতরাং কেহই জিদ ছাড়িলেন না।

গোলমালও মিটিল না।

বিশেষ ভাবনার কারণ হইয়া পড়িল।

মাতাব্বররা মণ্ডলি দিয়া বসিয়া এরপর কি করা যায় তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

অবশেষে একজন উম্মিলোক বলিল ঃ আজকে উভয় মৌলবী সাহেবের মত মতই জানাযা পড়া যাক; দু'জনের জিদই বহাল থাক। পরে দু'চার দিনের মধ্যে বড় বড়

আলেমের বাহাসের সভা ডেকে তাতে যে মত জিতবে, আমরা আগামীতে সেই মতই মনে চলব।

গরীবুল্লাহ সাহেব তৎক্ষণাৎ বলিলেন ঃ বাহাসে যার মত টিকবে, সরদারি তারই হবে ত?

সুধারামী সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন ঃ জানাযা নামাজের সঙ্গে সরদারির কি তা আল্লুক আছে? সরদারি এখন যেমন আছে তখনও তেমনি থাকবে।

প্রধান মাতব্বর সাহেব বলিলেন ঃ সে পরে দেখা যাবে। কিন্তু এখনকার মতো কি করা যায়? বাহাসের মহফেলও ত আর এমনি ডাকা যায় না। আর ও-যে বললে, দুই জনের মতে জানাজা পড়ার কথা, তাই বা কি করে হতে পারে? একই লাশের দু'বার জানাযা পড়া যায় কি? কি বলেন মৌলবী সাবরা?

উভয়ের মত মতো জানাযা পড়ার কথা যে বলিয়াছিল, মৌলবী সাহেবরা কোন জবাব দিবার আগেই সে দাঁড়াইয়া বলিল ঃ আমি দু'বার জানাযা পড়ার কথা বলি নাই। এক বারেই দুই-এর মত মতো জানাযা পড়া যেতে পারে।

সকলে, বিশেষ করিয়া মৌলবীদ্বয়, চিৎকার করিয়া বলিলেন ঃ কি রূপে?

সে বলিল ঃ শির আর সিনা খুব তফাৎ নয় ঃ পা একটু ফাঁক করে দাঁড়ালেই এক পা শির বরাবর আর এক পা সিনা বরাবর থাকবে। এতে উভয়ের মতই বজায় থাকবে। আর এমামতি কে করেন, সেটা ঠিক হয় এমামের পাওনা দিয়ে। এমামের পাওনা উভয় মৌলবীর মধ্যে সমান ভাগ করে দেওয়া হোক, তা হলেই উভয়ের এমামতি ঠিক থাকবে। কারও হারজিৎ হবে না।

এই ব্যবস্থা সকলের পছন্দ হইল! মাতব্বর সাব মৌলবী সাবদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেমন এ ব্যবস্থা চল্‌তে পারে? হাদিসের বরখেলাফ হবে না ত?

নায়েবে-নবীদ্বয় পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া মুহূর্তে দৃষ্টি বিনিময় করিলেন এবং প্রায় সমস্বরে বলিলেন ঃ হাদিস শরীফে এ বিষয়ে কোন নিষেধ নাই।

# লিভরে-কওম

ইসমাইল সাহেব ক্ষণজন্মা পুরুষ।

স্কুল হইতে মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসা হইতে স্কুল, এইভাবে বৎসরের পর বৎসর বহু স্থান বদলাইয়াও যখন কোনমতেই তিনি শ্রেণীবিশেষের মায়াজাল ছিন্ন করিতে পারিলেন না, তখন মফস্বলের শিক্ষকদের অপক্ষপাত ন্যায়-বুদ্ধিতে সন্দিহান হইয়া পুত্রহীনা বিধবা ফুফুর একমাত্র দওলত ছাগলটা পাশের গ্রামের বাজারে বিক্রয় করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই রাতেই কলিকাতার গাড়িতে চড়িয়া বসিলেন।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া একটি মসজিদে আশ্রয় লইলেন।

মফস্বলের লোক তাহার কদর না বুঝিলেও কলিকাতার লোক তাহার প্রতিভার সম্মান করিল। গলার আওয়াজ মিষ্টি হওয়ায় প্রথমে সেই মসজিদের মোয়াজ্জিন ও পরে এমাম নিযুক্ত হইলেন।

মসজিদটি ছিল কলিকাতার অল্পসংখ্যক আহলে-হাদীস মসজিদের অন্যতম।

সুতরাং হানাফীদিগের নিন্দা-কুৎসাই ছিল এখানকার প্রধান আলোচ্য বিষয়। মসজিদের মোতাওয়াল্লি সওদাগর হাজি সাহেবকে যদি খোদা একদিনের জন্যও এ দেশের বাদশা বানাইয়া দিতেন, তবে তিনি দেশকে হানাফী শূন্য করিয়া ফেলিতেন। সেদিকে সুবিধা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা আপাততঃ না থাকায় অগত্যা বাহাসের সভার আয়োজন করিয়া বেনারস ও অমৃতসর হইতে মওলানা আমদানি করিবার ব্যাপারে প্রচুর টাকা খরচ করিয়াই তিনি খোদার ঐ ভুলের প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইসমাইল সাহেব হানাফীদের পরিচালিত মাদ্রাসা-স্কুলে হানাফী শিক্ষকদের নিকট পড়াশোনা করিয়া অনেকটা হানাফী-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেও এখন হইতে তিনি অকস্মাৎ ভীষণ পাকা মোহাম্মদী বনিয়া গেলেন।

হানাফী-নিন্দায় অচিরকাল মধ্যে তিনি হাজি সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

প্রথম প্রথম তিনি মসজিদে বসিয়া ও পরে ক্রমে সমবেত মুসল্লিদের সামনে দাঁড়াইয়া চক্ষু বড় করিয়া হাত পা ছুঁড়িয়া উদ্দেশ্যে হানাফীদিগকে গালি পাড়িতেন। এইভাবে বক্তৃতায় অভ্যস্ত হইয়া ক্রমে বাহাসের সভায় যোগ দিলেন এবং শুধু যোগ দিলেন না— নামও করিলেন।

হাজি সাহেব খুশি হইলেন। আদর করিয়া বাবা বলিয়া পিঠে হাত বুলাইলেন।

ইসমাইল সাহেব হাজি সাহেবের কদমবুচি করিলেন।

সেইদিন হইতে হাজি সাহেবের বাড়িতেই ইসমাইল সাহেবের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত হইল।

# দুই

হানাফী-মোহাম্মদীর বাহাস ক্রমে খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিল।

দূরবর্তী স্থানসমূহ হইতেও বাহাসের দাওয়াৎ আসিতে লাগিল।

চতুর্দিকে একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল।

ইসমাইল সাহেব হাজি সাহেবকে নানা যুক্তি-তর্কের দ্বারা বুঝাইলেন যে, একটা কাগজ বাহির না করিলে প্রচারকার্য চালাইবার পক্ষে সুবিধা হইবে না; শুধু বাহাসের মজ্‌লিস করিয়া বিশেষ কোনও ফল পাওয়া যাইবে না; একটা কাগজ বাহির করিয়া তাতে মোহাম্মদী মযহাবের দলিলাদি পেশ করিয়া হানাফী মযহাবের অসারত্ব প্রমাণ করিয়া দিলে দলে দলে হানাফী মোহাম্মদী মত অবলম্বন করিবে। এই উপলক্ষ্যে খ্রিস্টান পাদ্রীদের ধর্ম-প্রচারের পদ্ধতি সম্বন্ধে স্বীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তিনি হাজী সাহেবের নিকট খুব চটকদার করিয়া বর্ণনা করিলেন।

হাজি সাহেব সমস্ত শুনিয়া বলিলেন ঃ সত্য নাকি বাবা?

ইসমাইল সাহেব খুব জোরের সঙ্গে বলিলেন ঃ নিশ্চয়, হুজুর।

দশ হাজার টাকা খরচ করিয়া প্রেস কেনা হইল। হাজি সাহেবের প্রকাণ্ড বাড়ির এক অংশে প্রেস বসিল। আর এক কামরায় আফিস হইল।

'আহলে-হাদিস-গুর্য' নামক কাগজ বাহির হইল। ইসমাইল সাহেবই সম্পাদক হইলেন। তিনি নিজের সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য বিনা-বেতনেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

হাজি সাহেব বলিলেন ঃ ইসমাইল মিয়া একটা মানুষ। খোদা একদিন তার এই ত্যাগের বদলা দিবেন।

'আহলে-হাদিস-গুর্য' চলিল। চলিল মানে বিলি-বিতরণ হইতে লাগিল। কাগজ-কলমে হানাফী-নিন্দার ঝড় বহিতে লাগিল।

ক্রমে হানাফী নিন্দার সঙ্গে-সঙ্গে ইংরাজদের নিন্দাও কিছু কিছু হইতে লাগিল।

ইসমাইল সাহেব কিছুটা জাতীয়তাবাদী হইয়া পড়িলেন।

হাজি সাহেব শুনিতে পাইয়া একদিন বলিলেন ঃ বাবা ইসমাইল; হানাফীদের সঙ্গেই আমাদের লড়াই, ইংরাজদের সঙ্গে ত আমাদের কোনও দুশমনি নেই।

ইসমাইল সাহেব বলিলেন ঃ তা বটে, কিন্তু আজকালকার লোকেরা মতিগতি যে কি রকম হয়ে গেছে, ইংরাজকে গাল না দিয়ে কাগজ বিকায় না। গ্রাহক বেশি না হলে কাগজে যে কেবলই লোকসান হবে। আপনাকে আর কতকাল খরচান্ত করাব?

হাজি সাহেব সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন ঃ না-না না হোক লোকসান। ইংরাজ রাজা, তাকে গাল দিয়ে শেষকালে কি একটা ফ্যাসাদে পড়ব? আমি লাভের জন্য কাগজ করি নাই; লোকসান হয় আমার হবে; খবরদার, তুমি ইংরাজদের বিরুদ্ধে কিছু লিখো না। পুলিশের হাঙ্গামার মধ্যে আমি নাই।

ইহার কিছুদিন পরে এক ভদ্রলোক হাজি সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। গম্ভীর মুখে হাজি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আপনারা ‘আহলে-হাদিস-গুর্য’ নামে কাগজ চালান?

—হাঁ, চালাই।

—এই কাগজের উপর সরকারের কুনজর পড়েছে।

—কেন, আমার কাগজে ত ইংরাজদের বিরুদ্ধে কোন কথা থাকে না।

—তা না থাক, সরকারের আরও গুরুতর সন্দেহ হয়েছে। আপনার কাগজের আফিস সীমান্তের ওহাবী কাফেলার শাখা।

হাজি সাহেব মাথায় হাত দিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন ঃ কি হবে তবে, বাবা ইসমাইল।

ইসমাইল সাহেব আগন্তকের সহিত কটাক্ষ বিনিময় করিয়া বলিলেন ঃ পুলিশে আমাদের ভয় কিসের? আমরা ত নির্দোষ।

আগন্তক বলিলেন ঃ হোন নির্দোষ; কিন্তু পুলিশ খানাতল্লাশ না করে ছাড়বে না।

ইসমাইল সাহেব ক্রোধে হাত নাড়িয়া বলিলেন ঃ খানাতল্লাশ করে পাবে কচু। আমরা এখানে ঢাল তলোয়ার বা বোমা লুকিয়ে রেখেছি, না?

আগন্তকও একটু উষ্ণ হইয়া বলিলেন ঃ পাবে না কিছু মানলাম, কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়িতে খানাতল্লাশ কত অপমানজনক, তা আপনি খেয়াল করছেন না।

ইসমাইল সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ঃ মান অপমান আমরা বুঝব। কে আপনি যে আমাদের ভয় দেখাতে এসেছেন।

—আমি পুলিশেরই লোক। তবে আমিও মুসলমান, তাই মুসলমান ভদ্রলোকের ইয্যতের জন্য আগে থেকে সাবধান করতে এসেছিলাম, আপনাদের গাল শুনতে আসি নাই। চললাম।

হাজি সাহেব ইসমাইল সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ কাজটা ভাল করলে না, বাবা। পুলিশের লোক চটিয়া দিলে? এখন কি হবে?

ইসমাইল সাহেব উপেক্ষার সঙ্গে বলিলেন ঃ কি আর হবে? খানাতল্লাশ করে পাবে কি?

পাক না পাক তার কথা পরে। আমার বাড়িতে পুলিশ হানা দিবে এ অপমান আমি সহ্য করব?

—আপনি যা হয় আদেশ করুন। আমার মনে হয়, ভয়ের কোন কারণ নাই।

হাজি সাহেব কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন ঃ ভয়ের কথা নয় বাবা, মান অপমানের কথা।

হাজি সাহেব সেইদিন বিকালে ইসমাইল সাহেবকে বলিলেন ঃ অন্য কোথাও বাড়ি ভাড়া কর। সমস্ত প্রেস, ‘আহলে-হাদিস-গুর্যে’র আফিস আমার বাড়ি থেকে সরাও। আমার বাড়িতে খানাতল্লাশ হতে দেব না। আর দেখ, প্রেস কিপারের স্থানে আমার নাম কেটে অন্য কারও নাম লিখিয়ে নাও। বুড়া বয়সে কোথায় আল্লাহ্-আল্লাহ করব, তা না করে ও-সব হাঙ্গামায় আমি কেন?

তাই হইল।

ইসলাম সাহেব অন্যলোক না পাইয়া নিজেই প্রেসের ‘কিপার’ হইলেন।

## তিন

নূতন বাড়িতে 'আহলে-হাদিস-গুর্যের আফিস প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইসমাইল সাহেব সম্পাদকের স্থলে নিজের নামের পরিবর্তে স্বীয় নিতান্ত অনুগত শ্যালক-কেরানির নাম ছাপাইলেন এবং কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় শীর্ষদেশে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হইল ঃ 'মওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব প্রতিষ্ঠিত।'

কাগজের উদ্দেশ্যের স্থলে লেখা হইল ঃ 'বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে একতা ও সম্প্রীতি স্থাপন এবং তাহাদের সাহিত্যিক, রাজনীতিক, সমাজনীতিক ও বাণিজ্যনীতিক উন্নতিবিধান।

নূতন বাড়িতে 'আহ্‌লে-হাদিস-গুর্য' প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রথম সংখ্যাতেই সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হইল ঃ দয়াময় আল্লাহ্‌তালার অসীম কৃপায় ও সমাজের অকৃত্রিম হিতৈষী বঙ্গবিখ্যাত আলেম, মুসলিম বঙ্গের অবিসম্বাদিত নেতা মওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের অসাধারণ ত্যাগ স্বীকারের ফলে 'আহ্‌লে-হাদিস-গুর্য' আজ অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিল। গ্রাহক-অনুগ্রাহকগণের সহানুভূতি মাত্র সম্বল করিয়া মওলানা সাহেব এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এ কাজে তিনি মুসলিম বঙ্গের আশাতীত সহায়তা পাইয়াছেন। তারই ফলে সামান্য মূলধন লইয়া মওলানা সাহেব এই কাজে হাত দিয়াও আজ 'আহ্‌লে-হাদিস-গুর্য'কে নিজের পায়ে দাঁড় করাইতে সমর্থ হইয়াছেন। মওলানা সাহেবের বাড়ির অবস্থা স্বচ্ছল না হলেও তিনি এযাবৎ কাগজের তহবিল হইতে এক কপর্দকও গ্রহণ করেন নাই। বরং সংসার হইতে 'আহলে-হাদিস-গুর্য'কে সাহায্য করিতে গিয়া তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার জন্য মওলানা সাহেব বিন্দুমাত্র দুঃখিত নহেন। তাঁহার প্রাণের ধন সাধারণ বস্তু 'আহ্‌লে-হাদিস-গুর্য'কে তিনি হৃদয়ের প্রতি শোণিতবিন্দু দিয়া জীবনের পথে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সেই পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তালার দরবারে শোকর গুজারি করিতেছেন।

এই ধরনের অন্যান্য কথার পর লেখা হইল ঃ মওলানা সাহেব কেবল মাত্র আহলে-হাদিস-সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্যই প্রথম 'গুর্যের' প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু যাঁহার কর্মশক্তির নেয়ামত খোদাতালা সমস্ত মুসলিম-বঙ্গের ভোগ্য বলিয়া বিধান করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সেই অসাধারণ কর্মশক্তি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকিবে কেন? সমস্ত মুসলমানদের জন্যই খোদা যাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সাম্প্রদায়িক গণ্ডির মধ্যে নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়া স্বীয় জ্ঞানের আলো হইতে অধঃপতিত মুসলমান সমাজকে বঞ্চিত করিয়া খোদার আদেশ অমান্য করিতে পারেন না। সমস্ত বাঙলার মুসলমান সম্প্রদায়ের অধঃপতিত অবস্থা দর্শন করিয়া মওলানা সাহেবের উদার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সমস্ত মুসলমানের কল্যাণ সাধনের জন্য এহ্‌তেকাফে বসিয়াছেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে মুসলিম-বঙ্গের সার্বজনীন কল্যাণ সাধন করা যায়, কি কর্মপন্থার দ্বারা খোদার প্রেম ইসলামকে দেশের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, গত দুই সপ্তাহ যাবৎ তিনি তজ্জন্য কঠোর ধ্যানে মগ্ন হইয়াছেন। শীঘ্রই 'গুর্যে'র মারফত তার ফলাফল সাধারণ্যে ঘোষণা করা হইবে। মুসলিম-বঙ্গ প্রস্তুত হও।

অতঃপর 'গুর্যে'র ভবিষ্যৎ 'অসাম্প্রদায়িক' নীতির কথা বর্ণনা করিয়া এইভাবে

প্রবন্ধের উপসংহার করা হইল ঃ ইসলাম ও মুসলিম-বঙ্গের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আমাদের ধর্মীয় ও রাজনীতিক গুরু মওলানা সাহেব বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করায় 'গুর্য' পরিচালনের গুরু দায়িত্ব আমাদের দুর্বল ও অযোগ্য স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছে। 'গুর্য' পরিচালনে মওলানা সাহেবের জ্ঞানালোকে, অনুপ্রেরণা ও উপদেশই আমাদের পথ-নির্দেশ করিবে বটে তথাপি সমাজের হিতৈষী ব্যক্তিগণের ও জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতাও কামনা করিয়া আমরা আজিকার এ জয়যাত্রা আরম্ভ করিলাম।

ইহার পর হইতে 'গুর্যের' সম্পাদকীয় স্তম্ভে মযহাবী ঝগড়া বিবাদের তীব্র নিন্দা করিয়া, প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত মুসলমান সম্প্রদায়ের দূরবস্থার তুলনা করিয়া এ বিষয়ে কোনও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি দৃষ্টি দিতেছেন না বলিয়া আর-আর নেতৃবৃন্দের কার্যের নিন্দা করিয়া এবং যে একজন মাত্র লোক সমাজের জন্য শিবরাত্রির শলিতার মতো গোপনে বিন্দু বিন্দু করিয়া নিজের শোণিত দান করিতেছেন, তাঁহার দীর্ঘ জীবনের জন্য খোদার নিকট দোওয়া করিতে সমস্ত পাঠক-পাঠিকাকে অনুরোধ করিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ রাশি রাশি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল।

বলাবাহুল্য, ইসমাইল সাহেবই নিজ হাতে ঐসব সম্পাদকীয় লিখিতেন এবং ধ্যান এহতেকাফ যা করিয়া সশরীরে 'গুর্য'-কার্যালয়ে অবস্থান করিয়াই সব করিতেন।

'গুর্যে'র লেখা জনসাধারণের অধিকাংশের হৃদয় জয় করিল। সাম্প্রদায়িক কলহের অবসান-প্রাক্কালে এমন উদার বাণী অনেকের নিকটই নূতন ও মহান বোধ হইল।

দলে-দলে 'গুর্যে'র গ্রাহক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

যথা-সময়ে সব কথা হাজি সাহেবের কানে গেল। তিনি ইসমাইল সাহেবকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ বাবা অন্য সব যা লিখেছ, তার জন্য আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই না। তোমার ঈমানে যা নেয়, তাই করো ঃ আমি ওথেকে লাভ করব বলে কাগজ বের করি নাই। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ত্যাগ করতে যাচ্ছ, তাতেই আমার আপত্তি।

ইসমাইল সাহেব হাজি সাহেবের সম্মুখে নত হইয়া তাঁর কদমবুসি করিলেন; তাঁর বাম হাতটি নিজের মাথায় লইয়া বিনীতভাবে বলিলেন ঃ আপনি বরাবর আপনার এই অযোগ্য সন্তানের বুদ্ধি-বৃত্তির উপর নির্ভর করে আসছেন। আশা করি, সে-বিশ্বাস আপনার এখনো টলে নাই। আপনি পিতৃতুল্য, আপনার কাছে গোপনীয় কিছু নাই। আহলে-হাদিস মত প্রচার করতে গিয়ে আমি বাজারের মামুলি পন্থা অবলম্বন করতে চাই নে। আপনি জানেন, আমি খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচার প্রণালী বহুদিন ধরে অধ্যয়ন করে আস্‌ছি। এ বিষয়ে আমি তাদের নীতিই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। উদারতার ছদ্মবেশে সাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রচারেই সাফল্যের আশা অধিক।

হাজি সাহেবের সন্দেহ অনেকটা দূর হইল। তিনি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন ঃ আচ্ছা বাবা, যা হয় কর। আমি আর কি বলব? আমাদের উদ্দেশ্য যেন ভুলে যেয়ো না।

ইসমাইল সাহেব দৃঢ়তার হাসি হাসিয়া আবার মাথা ঝুকাইয়া বলিলেন ঃ আপনি দোয়া করুন।

হাজি সাহেব খুশি হইলেন।

ইসমাইল সাহেব বিদায় হইলেন।

## চার

'গুর্যের পাঠক-পাঠিকার প্রাণ বহুদিন প্রতীক্ষার সূতায় লটকাইয়া রাখিবার পর ইসমাইল সাহেবের এহ্‌তেকাফের ফল বাহির হইল।

একদিন সম্পাদকীয় স্তম্ভে এইরূপ লেখা হইল ঃ অধঃপতিত বঙ্গ-মুসলিমের দুরবস্থা দর্শনে যে মহাপুরুষের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, যিনি সংগোপন লোক-লোচনের অন্তরালে সমাজের কল্যাণ কঠোর সাধনায় শিবরাত্রির শলিতার মতো নিজকে তিল তিল করিয়া বিসর্জন দিতেছিলেন, খোদার দরবারে হাজার শোকর, আমাদের সেই পূজনীয় নেতা হযরত মওলানা সাহেব তদীয় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘ একমাস এহ্‌তেকাফে বসিয়া খোদার দরবার হইতে এল-হামের অনুপ্রেরণা পাইয়াছেন। সমস্ত মুসলিম বঙ্গ আজ সমস্বরে বল ঃ আল্লাহু আকবর।

এহ্‌তেকাফে বসিয়া হযরত মওলানা সাহেব কি এহলাম পাইয়াছেন, সমাজের কল্যাণের কি অনুপ্রেরণা তিনি লাভ করিয়াছেন, প্রবন্ধের বাকি অংশে সে-সমস্ত কথা বর্ণনা করা হইল। তার সারমর্ম এই মুসলিম বঙ্গের অদ্বিতীয় নেতা হযরত মওলানা সাহেব শিবরাত্রির শলিতার মতো তিলে তিলে আত্মবিসর্জন দিয়া আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামিনের নিকট হইতে যে এহলাম পাইয়াছেন তা এই ঃ ইসলামের রজ্জুকে শক্ত করিয়া না ধরার অপরাধেই মুসলিম বঙ্গ এই শাস্তি ভোগ করিতেছে। মুসলিম বঙ্গের উন্নতি করিতে হইলে বাংলায় ইসলামকে পুনর্জীবিত করিতে হইবে; খ্রিস্টান পাদ্রিদের ধোঁকায় পড়িয়া লক্ষ লক্ষ মুসলিম আজ মুরতেদ হইয়া যাইতেছে, ইহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে; ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগকে ইসলামের সুশীতল ক্রোড়ে স্থান দিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইভাবে সমাজের দুরবস্থা ও তার প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করিয়া উপসংহারে হযরত মওলানা সাহেবের এলহাম-প্রাপ্ত তরকিবের কথা বলা হইল। তা এই : এতদুদ্দেশ্যে হযরত মওলানা সাহেব আঞ্জুমনে-তবলিগুল ইসলাম নামক একটি আঞ্জুমন কায়েম করিয়াছেন। আপাততঃ কলিকাতার কতিপয় উৎসাহী ও দেশ বিখ্যাত আলেমকে সদস্য করিয়াই এই আঞ্জুমন গঠিত হইয়াছে। সদস্যগণের সনির্বন্ধ ও সর্বসম্মত অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও হযরত মওলানা সাহেব উক্ত আঞ্জুমনের সভাপতি সম্পাদক কোষাধ্যক্ষের বিরাট দায়িত্ব বহন করিতে রেযামন্দি ফরমাইয়াছেন। দীর্ঘকাল সমাজের খেদমতে রাতদিন অবিশ্রান্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে হযরত মওলানা সাহেবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার উপক্রম হইয়াছে সেজন্য অন্য কোনও নবীন কর্মীর স্কন্ধে এই বিরাট দায়িত্ব অর্পিত হইলে আমরা সুখী হইতাম। কিন্তু সত্যের খাতিরে একথা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, হযরত মওলানা সাহেব ব্যতীত এত বড় বিরাট দায়িত্ব বহন করার লোকও দেশে সুলভ নয়। কাজেই হযরত মওলানা সাহেবের সাস্থ্য সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমরা এই নির্বাচনে আঞ্জুমনের সদস্যগণের দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

অতঃপর কি প্রণালীতে বিভিন্ন জিলায় এই আঞ্জুমনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইবে, প্রবন্ধের বাকি অংশে তাহা বর্ণনা করা হইল।

কমিশন, রাস্তা খরচ ও ভাতা বাদে প্রচারকের ত্রিশ টাকা করিয়া বেতন ধার্য করিয়া আপাততঃ কমপক্ষে প্রচারক পাঠাইতে কিভাবে অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকার দরকার, প্রবন্ধে তারও নির্ভুল হিসাব প্রদর্শিত হইল। তিন কোটি মুসলমান-অধ্যুষিত বাংলায় ইসলামের খেদমতের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা যে কিছু নয়, খুব উদ্দীপনাময়ী ভাষায় তা বলিয়া প্রবন্ধে উপসংহার করা হইল এবং বারান্তরে এ বিষয়ে আরও বলা হইবে বলিয়া পাঠকগণকে আশ্বাস দেওয়া হইল।

দেশময় হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

কমিশন, রাস্তা খরচ ও ভাতা বাদে ত্রিশ টাকা মাহিয়ানার সম্ভাবনায় দেশের মাদ্রাসা-পাশ মৌলবী সাহেবদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল।

বেকার গ্র্যাজুয়েটেরা মৌলবী না হওয়ার জন্য অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল এবং প্রচারকের যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলামের সৌন্দর্যে ওয়াকিফহাল হইবার জন্য আহমদিয়াদের প্রকাশিত ইংরাজী গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়া গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন করিতে লাগিল। 'গুর্য' আফিসে চাঁদার মনিঅর্ডার এবং প্রচারক পদপ্রার্থীদের দরখাস্তের বন্যা প্রবাহিত হইল।

'গুর্য'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ভাষার বোমাবাজি হইতে লাগিল। হযরত মওলানা সাহেবের প্রশংসাসূচক কবিতা ছাপা হইতে লাগিল। বাঙলার মুসলমান বুঝিল, এতদিনের অধঃপতিত মুসলমানের সুদিন আবার ফিরিয়াছে। মফস্বলের বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতি মজলিস-মহফিল, সম্মিলন কনফারেন্স হইতে লাগিল। বিভিন্ন স্থান হইতে হযরত মওলানা সাহেবের দাওয়াত তিনি রক্ষা করিতে লাগিলেন। যাহারা বড় বড় কনফারেন্স করিয়া হযরত মওলানা সাহেবের সম্বর্ধনা করিলেন এবং মালা ও অভিনন্দনপত্র ছাড়া যাহারা মোটা মোটা চাঁদা তুলিয়া দিল, 'গুর্যে' তাহাদের সম্বন্ধে প্রশংসা-সূচক রিপোর্ট ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইতে লাগিল।

চাঁদা আদায় হইয়াছিল আশাতীত, সুতরাং ইসলাম প্রচারের কাজ নিশ্চয় আরম্ভ হইত, কিন্তু উপর্যুপরি নূতন-নূতন কতকগুলি দুর্ঘটনা ঘটায় ইসলাম প্রচারের কাজে বাধা পড়িল।........

বেআক্কেলপুরে হিন্দু—মুসলিম দাঙ্গা হইল। হিন্দু প্রধান স্থান বলিয়া হিন্দুরা মুসলমানদিগকে বেদম মার দিল। 'গুর্যে' নির্যাতিত মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার মর্মভেদী বর্ণনা বাহির হইতে লাগিল। 'গুর্য' কার্যালয়ে হযরত মওলানা সাহেবকে সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ করিয়া এক রিলিফ ফাণ্ড খোলা হইল। স্বয়ং হযরত মওলানা সাহেব দিনরাত খাটিয়া অকুস্থানে গমন করিয়া রিলিফের কাজ করিতে লাগিলেন।

হযরত মওলানা সাহেবের অদৃষ্টেও বিশ্রাম ছিল না, বাঙলায় ইসলামেরও ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না।

তাই বেআক্কেলপুরের রিলিফ কার্য সমাধা করিয়া যেই হযরত মওলানা ইসলাম প্রচারের কাজে হাত দিবেন, অমনি দুর্ভাগ্যপুরে ভীষণ বন্যা হইল।

জনসেবক হযরত মওলানার প্রাণ আবার কাঁদিয়া উঠিল। বেআক্কেলপুরের মুসলমানদের জন্য কান্না রঙিন চোখে তিনি আবার দুর্ভাগ্যপুরের বন্যাপীড়িতদের জন্য অশ্রু বহাইতে লাগিলেন। আবার রিলিফ ফাণ্ড খোলা হইল। 'গুর্যে'র পৃষ্ঠায় আবার উদ্দীপনার তুবড়ি ফুটিতে লাগিল।

টাকা আসিতে লাগিল।

রিলিফ চলিতে লাগিল।

সত্যিকার কর্মীদের জীবনে বিশ্রাম নাই। তাঁহাদের নিঃশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ নাই। তাই দুর্ভাগ্যপুরের রিলিফ কার্য শেষ হইবার পূর্বেই দেশ খেলাফত আন্দোলনের বন্যায় ভাসিয়া গেল।

হযরত মওলানা মুসলিম-বঙ্গের সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য বিশ্বমুসলিমের বিরাট স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারিলেন না। তিনি খেলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। দেশ তাঁহার বক্তৃতায় মাতিয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে হযরত মওলানা উর্দু বয়ানও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং বাঙলার বাহিরেও তিনি বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

'গুর্যের' সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁহাকে বঙ্গ-গৌরব বলিয়া অভিনন্দিত করা হইল।

দেশময় সম্মিলন-কনফারেন্স হইতে লাগিল।

হাজি সাহেবের উদ্যোগে এই আহ্‌লে হাদিস কনফারেন্সের এক অধিবেশনের আয়োজন হইল।

হযরত মওলানাও নিমন্ত্রিত হইলেন। কিন্তু তিনি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

'গুর্যে' হযরত মওলানার এই অসম্প্রদায়িক স্পষ্টবাদিতার জন্য তাঁহার প্রশংসা করা হইল এবং ইসলামের এই দুর্দিনে যাঁহারা মযহাবী সভা-সমিতি করিয়া ইসলামের শক্তিকে শতধা বিভক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের তীব্র নিন্দা করা হইল।

গোঁড়া আহ্‌লে হাদিস ব্যতীত আর সকলে হযরত মওলানা সাহেবকে সাধুবাদ দিতে লাগিল। 'গুর্যের' জনপ্রিয়তা বাড়িয়া গেল।

দেশ খেলাফতের বন্যায় ভাসিয়া গেল।

কংগ্রেসও খেলাফত আন্দোলনকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিল।

'গুর্যে' হিন্দু-মুসলিম একতার মহিমা কীর্তিত হইতে লাগিল।

হযরত মওলানা সাহেব দেশময় লাটিমের মতো ঘুরিয়া হিন্দু-মুসলিম একতা প্রচার করিতে লাগিলেন। পরাধীন জাতির কোনও ধর্ম নাই, কোরআন-হাদিস দ্বারা তিনি ইহা প্রমাণ করিতে লাগিলেন। ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে যে মুসলিম-দুনিয়ার আবাদি, এমন কি মক্কা-মদিনার হুরমত রক্ষা হইবে না, মাসের পর মাস ধরিয়া গুর্যে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই সত্য প্রচার চলিতে লাগিল।

যাহারা খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিল না শুধু তাহারাই এবং যাহারা কমিশন-রাস্তা-খরচ-ও-ভাতা-বাদে ত্রিশ টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করিয়া এইরূপ অতীষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারাই পত্র লিখিয়া 'গুর্য' অফিসে এবং সভা-সমিতিতে স্বয়ং হযরত মওলানার কাছে তবলিগের কি হইল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

প্রথম-প্রথম ঐ সকল প্রশ্ন উপেক্ষা করা গেল। কিন্তু যখন প্রশ্ন-কর্তার সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন 'গুর্যে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে এবং সভা-সমিতিতে স্বয়ং হযরত মওলানার বক্তৃতায় যে কৈফিয়ত দেওয়া হইল, তার সারমর্ম এই : ভারতে স্বরাজ সমস্যাই এখন ভারতবাসীর জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। এই স্বাধীনতার উপর কেবল যে ভারতীয় মুসলমানের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে তা নয়, উপরন্ত ইহার উপর মধ্য

প্রাচ্যের সমস্ত মুসলিম রাজশক্তির স্বাধীনতা নির্ভর করিতেছে। এই স্বরাজ সাধনায় হিন্দু-মুসলিম একতা অপরিহার্য। বর্তমান অবস্থায় তবলিগকার্যে হাত দিলে হিন্দু-মুসলিম একতায় বিঘ্ন উৎপন্ন হইবে। সুতরাং যাহারা দেশের সংকট অবস্থায় তবলিগ কার্যে হাত দিয়া হিন্দু-মুসলিম একতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে চায়, তাহারা শুধু দেশের শত্রু নয়, ইসলামেরও শত্রু।

ইসলামের অনিষ্টের ভয়ে প্রতিবাদীদের অনেক চুপ করিয়া গেল; কিন্তু সকলে চুপ করিল না। কেহ কেহ বলিতে লাগিল : তবলিগকার্য যদি আজকাল স্থগিতই থাকে, তবে উহার তহবিলের একটা হিসাব প্রকাশ করিয়া কত টাকা আছে তা দেখান হউক।

কতিপয় দুষ্ট লোকের উদ্যোগে অস্বরাজী ও অখেলাফতী নেতৃবৃন্দের এক সভা আহুত হইল। হযরত মওলানাকে সে সভায় বিশেষভাবে দাওয়াৎ করা হইল। তিনি অসুস্থ শরীরে সেই সভায় যোগদান করিলেন। সভায় তবলিগ ফাণ্ডের সঙ্গে খেলাফত রিলিফ ফাণ্ডাদির কথা উঠিল।

হযরত মওলানা রুগ্ন শরীর লইয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন ঃ একটা প্রাণ তিনি কতদিকে দিতে পারেন! তবলিগ নয়ত রিলিফ, নয় ত খেলাফত-সবইত তাঁহার একার ঘাড়ে। তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শিবরাত্রির শলিতার মতো নীরবে লোক লোচনের অন্তরালে তিল তিল করিয়া সমাজ, দেশ ও ধর্মের জন্য প্রাণ দিয়া শরীরের অবস্থা এই করিয়াছেন! অতগুলি তহবিল তাঁহার হাত দিয়া খরচ হওয়ায় তিনি যদি খরচাদির চুল চেরা হিসাব রাখিতে নাই পারিয়া থাকেন, তজ্জন্য কি তাঁহার দোষ দেওয়া যায়? সদস্যবৃন্দ কি তাঁহার সন্দেহ করেন? সত্যই যদি তিনি দেশবাসীর



হযরত মওলানা অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন ঃ

এবং সহকর্মী সুহৃদগণের বিশ্বাস হারাইয়া থাকেন, তবে তাঁহার আর বাঁচিয়া লাভ কি? তবে আর তিনি বাঙলায় মুখ দেখাইবেন না। তিনি বাঙলার নেতৃত্ব ফেলিয়া রাঁচি চলিয়া যাইবেন।

ইতিমধ্যে দেশের 'তালুক-মূলক বিক্রয় করিয়া' হযরত মওলানা রাঁচিতে একখানি 'কুটির' কিনিয়াছেন বলিয়া লোকে বলাবলি করিত।

হযরত মওলানা রাঁচি চলিয়া গেলে মুসলিম-বঙ্গের গুরুতর অনিষ্ট হইবে নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়া উপস্থিত সদস্যবৃন্দের অনেকে মওলানার নিকট ক্ষমতা চাহিলেন এবং যাহারা তাঁহার সততায় সন্দেহ করিয়াছে তাহাদের উদ্দেশ্যে গালাগালি করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

'অকৃতজ্ঞ' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পর সপ্তাহে 'গুর্য' সন্দেহ-বাদীদিগকে খুব তেরেসে কষাঘাত করা হইল।

সন্দেহবাদীর সংখ্যা হ্রাস পাইল।

## ছয়

হিসাব-পত্রের ফ্যাসাদ সম্বন্ধে এরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া হযরত মওলানা আবার হিন্দু-মুসলিম একতা এবং স্বরাজের আবশ্যকতা বর্ণনায় অনলবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই কার্যে তিনি অনেক হিন্দু চরমপন্থীকে লজ্জা দিতে লাগিলেন।

চাকুরি ব্যতীত অন্য সর্বত্র হিন্দুরা মুসলিম প্রতিভার সমাদর করে। তাহাদের নিকট হযরত মওলানার কদর ধাপে ধাপে বাড়িতে লাগিল। কংগ্রেস হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্ম-মন্দির, অদ্বৈতবাদ সভা, থিওসফিক্যাল সোসাইটি, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সভা ইত্যাদি সকল সভ -সমিতিতেই মওলানা সাহেবের নাম সভাপতি রূপে বিজ্ঞাপিত হইতে লাগিল। হিন্দু বক্তা ও শ্রোতা সবাই স্বীকার করিলেন যে মুসলমানদের মধ্যে অত ভাল বাঙলা বক্তা আছে, হযরত মওলানা সাহেবের বক্তৃতা শুনিবার আগে একথা তাহারা বিশ্বাসই করিতেন না।

'গুর্যে'র অনেক হিন্দু গ্রাহক হইয়া গেল।

একদিন হযরত মওলানা কেবল তবলিগ, আঞ্জুমান ও খেলাফতের নেতা ছিলেন, হিন্দুদের কদরদানিতে এইবার তিনি কংগ্রেসেরও অন্যতম প্রধান নেতায় উন্নতি হইলেন। বাঙলার মুসলমানদের মুখোজ্জ্বল হইল।

স্মাইলস্ সাহেব বলিয়াছেন ঃ প্রতিভা কখনও চাপা থাকে না। হযরত মওলানা ইসমাইলের প্রতিভাও চাপা রহিল না। হযরত মওলানা প্রতিভা বলে আরও উন্নতি করিতেন, যদি না একটা বিষম বাধা সামনে পড়িল। এই বাধা আমলাতন্ত্র।

আমলাতন্ত্র কেবল নিজেদের দফতরেই মুসলমানকে দাবাইয়া রাখিয়া সন্তুষ্ট নহে, বাহিরে কোথাও মুসলমান উন্নতি করিবে, এটাও তাহারা সহ্য করিতে পারে না। হযরত মওলানা লোকচক্ষুর গোচরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ তাঁহার পিছনে লাগিল।

দেশময় ধরপাকড় আরম্ভ হইল। হযরত মওলানার বিবি বিষম শয্যগেত কাতর থাকার দরুণ মওলানা সাহেব অনেক সভায় অনুপস্থিত থাকিতে বাধ্য হইতে লাগিলেন।

কিন্তু আমলাতন্ত্র হিংসুক। তাই তাহাদের পুলিশ হযবত মওলানার গ্রেফতারি পরওয়ানা লইয়া তাঁহার বাড়িতে উপস্থিত হইল।

নির্জন বাড়িতে কাপুরুষের মতো ধরা দিতে হযরত মাওলানা অপমান বোধ করিলেন এবং গ্রেফতারের সময় দেশবাসীকে অভয়বাণী দিয়া যাওয়া কর্তব্য বিবেচনা করিলেন। তাই তিনি পশ্চাৎদ্বার দিয়া এক পার্কে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা শুরু করিলেন। হযরত

মওলানাকে প্রায় সবাই চিনিত। লোকের ভিড় হইল। পুলিশ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সেখানে পৌঁছিতে পার্ক জনাকীর্ণ হইয়া গেল।

তুমুল 'বন্দেমাতরম্' 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনির মধ্যে হযরত মওলানা গ্রেফতার হইলেন। কিন্তু মরণাপন্ন বিবি সাহেবের শুশ্রুষার জন্য জামিনে খালাস হইতে বাধ্য হইলেন।

'গুর্যে' 'অশনিম্পাৎ" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাহির হইল। বাঙলা যে নেতৃত্বশূন্য হইল প্রবন্ধের গোড়ার দিকে সেজন্য দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর দুশ্চিন্তা প্রকাশ করা হইল; হযরত মওলানার গ্রেফ্তারে স্বরাজ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা যে দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল, প্রবন্ধর মধ্যভাগে তা বলা হইল এবং দেশবাসীর প্রাণ-পুত্তুলি অদ্বিতীয় নেতা যে কারা-প্রাচীরের অন্তরাল হইতেও তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি বলে দেশবাসীর অন্তরে অনুপ্রেরণা যোগাইবেন, প্রবন্ধের উপসংহারে সে আশাও প্রকাশ করা হইল।

বিচারে হযরত মওলানার দুই বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

দেশের কাজে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শিবরাত্রির শলিতার মতো তিল তিল করিয়া আত্মদান করায় হযরত মওলানার স্বাস্থ্য ইতিপূর্বেই একরূপ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কারাবাসের কঠোরতায় তিনি একেবারে শয্যা লইলেন। তিন মাস কারাবাসের পর স্বাস্থ্যনাশের ভয়ে সরকার তাঁহাকে মুক্তি দিলেন।

হযরত মওলানা ভগ্নস্বাস্থ্য পুনঃলাভের জন্য রাঁচি চলিয়া গেলেন। আর ফিরিলেন না।

নেতার অভাবে আবার বাঙলা অন্ধকার হইল। ভক্তেরা তাঁহার পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল। 'গুর্যে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে বাহির হইল ঃ

বাংলায় ইসলামকে তার পূর্ণ গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করাই হযরত মওলানার আজীবন সাধনা। তিনি আজিও আগের মতই এই সাধনায় শিবরাত্রির শলিতার মতো লোক-লোচনের অন্তরালে নিজেকে তিল-তিল করিয়া বিসর্জন দিতেছেন। তবে স্বভাবতঃই তাঁর সাধনার বাহ্যরূপের একটু পরিবর্তন হইয়াছে। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। হযরত মওলানাও জীবন-সায়াহ্নে উপস্থিত। এই সময়ে তিনি যদি দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য একটা স্থায়ী দান রাখিয়া না যান,তবে হযরত মওলানার অবর্তমানে মুসলিম বাংলা চিরতরে অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবে। অথচ রাজনৈতিক হৈ চৈ-এর মধ্যে সে আত্মিক সাধনা সম্ভব নহে। তাই তিনি সহকর্মীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্থির করিয়াছেন ঃ একদিন ইসলামের মহাপয়গম্বর যেমন করিয়া সত্যের আলোকের জন্য হেরার নির্জন গহ্বরে আত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এই তের শত বৎসর পরে তাঁরই নগণ্য উম্মত হযরত মওলানা ইসলামের উন্নতি ও মুসলমানদের কল্যাণের জন্য রাঁচির শান্ত প্রকৃতির বুকে সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবেন। তিনি বাকি জীবনে সেই কঠোর সাধনাতেই সমাহিত থাকিবেন। তাঁহার সাধনার ফল গ্রন্থাকারে বাহির হইবে। 'গুর্যের' গ্রাহক-গ্রাহিকাদিগকে তাহা অর্ধমূল্যে দেওয়া হইবে।

প্রবন্ধের বাকি অংশ প্রকাশিতব্য গ্রন্থের সম্ভাব্য আকার, দাম ও অগ্রিম মূল্য প্রেরকদের বিশেষ সুবিধা বর্ণিত হইল। তারপর উপসংহারে বলা হইল। সশরীরে হযরত মওলানা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে থাকিবে না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইলে মুসলিম-বঙ্গ তার অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে। সুতরাং কোনও ভয় নাই। মুসলমান সমাজ অগ্রসর হও। নসরুম মিনাল্লাহে ফৎহুন কবির।

# মুজাহেদিন

প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগঠনের ঢেউ উঠিয়াছে। ও-পাড়ার ব্রাহ্মণ-বৈদ্য সবাই মিলিয়া শুদ্রদের জলগ্রহণ করিবার জন্য দৃঢ়-সংকল্প হইয়াছে।

দেখাদেখি এ-পাড়ার মুসলমান যুবকদের মধ্যেও উৎসাহের বান ডাকিয়াছে। তারা ফুটবল ও তাশ খেলা ছাড়িয়া দিন-রাত সভা-সমিতি করিতেছে, তনযিম কমিটি গঠন করিতেছে, আখড়া স্থাপন করিতেছে, লাঠি ভাজিতেছে, 'বেদে' 'হাজাম' প্রভৃতি 'অস্পৃশ্য' মুসলমানদিগকে সমাজে গ্রহণ করিবার কথা প্রবীণদিগের নিকট পাড়িবার পরামর্শও করিতেছে।

তরুণের উৎসাহ ঝড়ের আগুন। যে আগুনে দেশের জনসাধারণও জ্বলিয়া উঠিল। তারা উৎসাহে মাতিয়া গেল। আহার-নিদ্রা অবহেলিত হইল! দলে-দলে তরুণ বুড়া 'আল্লাহ্ আকবার' বলিয়া ভিক্ষায় বাহির হইল। ধান চাউল পাট কাঠ বাঁশ যে যা দিল, সবই গ্রহণ করিল। নিজেরা তা কাঁধে করিয়া এক ঠাঁই জড় করিল। সদলবলে জমিদারের বাড়ি ধন্না দিল। জমি আদায় করিল। ধান চাউল পাট বিক্রয় করিয়া সুতার ডাকিল। ঘর উঠিল।

যুবকেরা আবার বাড়ি বাড়ি দাওয়া করিল। ছেলে ধরিয়া আনিয়া এক সরগরম মাইনর স্কুল স্থাপন করিল। শহরে গিয়া স্কুল-পরিদর্শককে ধরিয়া আনিল। মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া সাহায্য আদায় করিল।

এ সব ঝড়ের বেগেই হইয়া গেল। প্রবীণেরা বুঝিতেই পারিলেন না- কোথা দিয়া কি হইল।

তরুণদের উৎসাহে এবং জনমতের চাপে অবশেষে প্রবীণদের রক্তও উষ্ণ হইয়া উঠিল। মাইনর স্কুলকে কিভাবে হাইস্কুলে পরিণত করা যায় সে সম্বন্ধে কল্পনা-জল্পনা চলিতে লাগিল।

পাশের গ্রামে এক পুকুরপাড়ে অনাদিকাল হইতে একটি 'খারেজী' মাদ্রাসা চলিয়া আসিতেছিল।

মৌলবী সাহেবের এলেমের দীর্ঘ-পাশ কতটা ছিল, তার এমতেহান লওয়ার সুযোগ কারো হয় নাই।

কারণ তালেব-এলেমদের পড়ান অপেক্ষা দাওয়াৎ খাওয়াতেই তার অধিক সময় ব্যয়িত হইত। তবু দাওয়াতের নাগাড় মরিত না। কারণ দাওয়াত সংগ্রহ করাই ছিল তালেব-এলেমদের প্রধান কাজ। এ কাজে তাদের উৎসাহ ছিল, কারণ মৌলবী সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও থোড়াবহুৎ রুখসতি মিলিত। আর এ কাজে তাদের দক্ষতাও ছিল

যথেষ্ট , কারণ তাদের অধিকাংশেরই এমন বয়স হইয়াছিল যা ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রের বাপকেই মানায় ভাল।

যাক, সেটা আসল কথা নয়।

আসল কথা এই যে, ঐ মাদ্রাসার ব্যয়-নির্বাহের জন্য এ-অঞ্চলের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া মুষ্টিভিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মৌলবী সাহেব স্থানীয় মসজিদের ইমাম ছিলেন বলিয়া এবং তাল-বেলেমরা বাড়ি-বাড়ি হাঁটিয়া আদায় করিত বলিয়া, সে মুষ্টি আদায়ে কারও ভুল-ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এতদ্ব্যতীত পাটের মওসুমে পাট, ধানের মওসুমে ধানও কিছু আদায় হইত। এতে করিয়া মৌলবী সাহেব মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা রোজগার করিতেন।

এত কাছে স্কুল স্থাপিত হওয়াতে ছাত্রের দিক দিয়া এই মাদ্রাসার ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও আসল জায়গায় ক্ষতি হইল- মুষ্টি চাউলের আয় আক্রান্ত হইল। মৌলবী সাহেব ইহার যথাসাধ্য প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু গ্রামবাসী অধিকাংশের মত অনুসারে মাইনর স্কুলের তহবিলেই মুষ্টি চাউল দেওয়া হইতে লাগিল।

## দুই

হঠাৎ সেই গ্রামে একজন জবরদস্ত আলেমের উদয় হইল। মাদ্রাসার মৌলবী সাহেব নবাগত আলেম সাহেবকে লইয়া বাড়ি বাড়ি দাওয়াত খাইতে লাগিলেন। তাঁকে 'মওলানা সাহেব' বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন।

মওলানা সাহেব শরা-শরিয়ৎ সম্বন্ধে ওয়াজ করিতে লাগিলেন। গ্রামের লোক অল্পদিনেই তাঁর লিয়াকতে আকৃষ্ট এবং ব্যবহারে মুগ্ধ হইল।

সকলেই যখন তাঁহাকে একজন বড়দরের আলেম বলিয়া বুঝিয়া ফেলিল ঃ তখন তিনি একদিন এক ওয়াজের মজলিসে অন্যান্য কথার পর বলিলেন ঃ খোদার ফযলে এ গ্রামের সকলেরই অবস্থা ভাল, অথচ দিনী এলেম শিক্ষার জন্য এখানে কোন মাদ্রাসা নাই; ইহা বড়ই আফসোসের কথা। এই প্রসঙ্গে খারেজী মাদ্রাসার কথা উঠিল। মওলানা সাহেব বলিলেন ঃ বড়ই দুঃখের কথা, বেশুমার আফসোসের কথা, যেখানে খোদা-রসূলের এলেম শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই মাদ্রাসার সাহায্য বন্ধ করিয়া, যেখানে বেদীন নাসারার ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, যেখানে ছেলেদের ঈমান-আমান খাওয়ার কায়দা বাৎলান হয়, হাযেরানে মজলিস কিনা সেই স্কুলে যাহায্য দিতেছেন!

ওয়াজের মহফেল বেশ বড়ই ছিল।

শ্রোতৃগণের কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে কোন কথা বলিতে মওলানা সাহেবকে বারণ করিলেন।

মওলানা সাহেব গলা ভারী করিয়া বলিলেন ঃ খোদার দীনের ইযযতের জন্য আমি তারই হুকুম তামিল করতে যাচ্ছিলাম, ওতে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই। আপনাদেরই আখেরাতের নেকবিদি ওর উপর নির্ভর করছে। আপনারা যদি না হক্কথা শুনতে চান, আমি জোর করে তা বলতে চাই না।

সভাস্থ দুই একজন খুব জোরে চিৎকার করিয়া বলিল ঃ মওলানা সাহেব, আপনি বলুন। এ বিষয়ে আপনাদের কর্তব্য কি তা আমরা জানতে চাই।

তখন মওলানা সাহেব খুব ওজস্বিনী সুরে হাদিস শরীফ হইতে বহু রেওয়ায়েৎ বয়ান করিয়া যা বলিলেন, 'লেকেন', 'মগর', 'ইয়ানে' ও 'ওগায়রা' গুলি বাদ দিলে তার অর্থ এই দাড়ায় : কেয়ামতের নয়দিকে এমন এক যমানা আসিবে, যখন লোক আখেরাতের চিন্তা ছাড়িয়া কেবল দুনিয়াবী খেয়ালে মশগুল থাকিবে। খোদাকে ছাড়িয়া বনি-আদম ধন-দওলতের এবাদত করিবে। মাদ্রাসা ভাঙ্গিয়া সেই জায়গায় স্কুল করিবে। মসজিদ ভাঙ্গিয়া সে স্থলে লোক মদের দোকান খুলিবে। এই গ্রামের অবস্থা দেখিয়া মওলানা সাহেবের মনে হইতেছে, বুঝি বা সেদিন আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি কেয়ামতের সমস্ত আলামত বয়ান করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, খানে-দয্যাল আসিবার আর অধিক দিন বাকি নাই। তার আগমনে মোমিন-মুসলমান ভাইদের উপর কি জুলুম-সেতম হইবে, ইসলামের কি বেইয্যতি হইবে, কাতর কণ্ঠে তার বিস্তারিত বয়ান করিতে করিতে মওলানা সাহেব চাওগার দামনে চোখ মুছিলেন। দেখাদেখি শ্রোতৃমণ্ডলির অনেকের চোখ ছল্‌ছল্‌ হইয়া উঠিল।

চোখ মূছার পর আবার তিনি ওয়াজ ধরিলেন। বলিলেন ঃ দীনি-এলেম শিক্ষার মাদ্রাসা নষ্ট করিয়া নাসারার ভাষা শিক্ষার স্কুলে সাহায্য করা বহুত গোনার কাজ। ইহা আমার ঘরের কথা নয়- হাদিস কোরআনের কথা।

বিশেষ করিয়া আখেরী জমানায় আরবী শিক্ষার পক্ষে তিনি যেসব যুক্তি দেখাইলেন, তার মধ্যে সর্বপ্রধান যুক্তিটি হইতেছে এই : ইমাম মেহদি ও খানে-দয্যালের নাযিল হইবার আর বিলম্ব নাই! আরবী জানা না থাকিলে ইহাদিগকে চিনিতে পারা যাইবে না। কারণ আরবী ভাষাতেই দয্যালের কপালে 'কাফের' এবং ইমাম মেহদির কপালে 'মোমিন' লেখা থাকিবে। উহারা কখন আসিয়া পড়েন, তার নিশ্চয়তা নাই। সেজন্য সকলেরই আরবী শিখিয়া সব সময় প্রস্তুত থাকা দরকার।

আর স্কুলের শিক্ষার বিরুদ্ধে মওলানা সাহেব যে সব যুক্তি প্রয়োগ করিলেন, তার মধ্যে সর্বপ্রথম যুক্তি এই : স্কুলসমূহএমন ধর্ম বিরুদ্ধে গাঁজাখোরি গল্পও শিক্ষা দেওয়া হয় যে, দুনিয়াটা গোল এবং তা ঘুরিতেছে। কোরআন-পাকে আল্লাহু-জল্লুশান সাফ ফরমাইয়াছেন : পৃথিবী ফরাশের মতো চ্যাপটা এবং স্থির। ছেলেবেলা হইতে কোরআনের খেলাফ শিক্ষা দান করিলে ছেলেরা কেন নাস্তিক হইবে না? ইহার জন্য দায়ী ছেলেরা নয়- ছেলেদের অভিভাবকরা।

মওলানা সাহেব ওয়াজ খতম করিলেন। সকলে এক বাক্যে তাঁহার ওয়াজের তারিফ করিল।

কিন্তু আসল কাজের কিছু হইল না। গ্রামের মধ্যে একদল তাঁহার সমর্থক জুটিল বটে, কিন্তু মাতব্বরের অধিকাংশ মাইনর স্কুলের দিকে থাকায় মুষ্টি চাউলটা স্কুলের তহবিলে যাইতে থাকিল।

তাই মৌলবী ও মওলানা সাহেব ইসলামের ইজ্জতের জন্য নূতন উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

## তিন

এই অঞ্চলে হানাফী ও মোহাম্মদী উভয় সম্প্রদায়ের বাস। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ-শাদি সমাজ-নমাজ মিলিয়া-মিশিয়া চলিত, কোন কলহবিবাদ ছিল না।

মাদ্রাসাটি যে পাড়ায় ছিল, তা হানাফী পাড়া; স্কুলটি যে পাড়ায় স্থাপিত হইয়াছিল, উহা ছিল মোহাম্মদী পাড়া। স্কুল-কমিটির অধিকাংশ সদস্য হানাফী হইলেও সেক্রেটারি সাহেব মোহাম্মদী।

নবাগত মওলানা সাহেব কয়েকদিন বিশেষ পর্যবেক্ষণের সহিত এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া একদিন গোপনে মৌলবী সাহেবকে বলিলেন ঃ আপনার উদ্দেশ্য সফল করতে হলে এখানে মযহাবের সওয়াল তোলা ছাড়া উপায় নাই।

মৌলবী সাহেব মাথা নাড়িয়া বলিলেন ঃ আমি ত্রিশ বৎসর এ গ্রামে বাস করছি; কোন দিন হানাফী-মোহাম্মদী ঝগড়া দেখিনি। কাজেই এদিকে আমার ভরসা হচ্ছে না।

হাসিয়া মওলানা সাহেব বলিলেন ঃ আপনার কিছু করতে হবে না; সব ব্যবস্থা আমি করব।

ব্যস্ত হইয়া মৌলবী সাহেব বলিলেন ঃ না না ও-কাজে আপনি হাত দেবেন না! শেষে আপনি বেইজ্জতি হবেন।

মওলানা সাহেব অধিকতর উচ্চ স্বরে হাসিয়া বলিলেন ঃ আপনার কোন ভয় নেই। বাহাসের ব্যাপারটা বড়ই আজব। ও-কাজে আমি বিশেষ ওয়াকেফহাল আছি। মুখে মুখে বাহাসের বিরোধী সবাই, ইহাঁতককে আমি নিজেও লেকেন একবার একটা খোঁচা দিয়ে দিতে পারলে সবাই তাতে নেচে ওঠে। ও কাজে একটা নেশা আছে। আপনি ভাববেন না। গ্রামকে গ্রাম যদি আমি নাচিয়ে না তুলতে পারি, তবে আমি বাপের পয়দাই নই।

মৌলবী সাহেব দেখিলেন, মওলানার কথাই সত্য। তিনি নিজে মযহাবি কলহের কথা স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই, অথচ আজ তার সম্ভাবনাতেই তাঁহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে।

মওলানা সাহেব পরের জুম্‌আতেই সুকৌশলে কথাটা পড়িলেন। তিনি বলিলেন ঃ হযরত নিজে বলে গিয়েছেন, তাঁর উম্মতের মধ্যে তেয়াত্তুর ফেরকা হবে; তেয়াত্তুরের মধ্যে সেরেফ এক ফেরকা বেহশতী, আর বাকি বাহাত্তুর ফেরকাই দুজখী। এখন সওয়াল এই যে, কোন্ ফেরকা বেহেশতী?

মওলানা সাহেব জওয়াবের জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু মুসল্লীদের নিকটই জওয়াব চাওয়া হইতেছে, এ কথা তাহারা কেউ বুঝিতে না পারায় কেউ জওয়াব দিল না। মওলানা সাহেব গর্জন করিয়া বলিলেন ঃ আপনাদের ইমান কি এতই কমজোর? আপনারা যে মযহাবের পা-বন্দ্ সেই মযহাব বেহেশতী কি দুজখী, সে সম্বন্ধে খোলাসা ধারণা আপনাদের নেই?

এইবার মুসল্লীদের-চৈতন্য হইল।

তাহারা বুঝিতে পারিল ঃ প্রশ্ন তাহাদিগকেই করা হইতেছে।

সকলে প্রায় সমস্বরে বলিল ঃ আমাদের মযহাবই বরহক।

মওলানা সাহেব খুশি হইয়া বলিলেন ঃ আমাদের মযহাব যদি বরহক হয় তবে ঐ পাশের গ্রামের মোহাম্মদীরা দুজখী কি না?

বহু কণ্ঠে আপত্তি উঠিল? মোহাম্মদীদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবেন না। কে বেহেশ্তী কে দুযখী, সে বিচার করবেন খোদা।

মওলানা সাহেব বলিলেন ঃ আপনারা হাদিস মানেন; সেই হাদিসই খোলাসা বলে দিচ্ছে, এক ফেরকা মাত্র বেহেশ্তী! এই এক ফেরকা যদি হানাফী মযহাব হয়, তবে মোহাম্মদীরা বেশক দোযখী। আর যদি মোহাম্মদীরা বেহেশ্তী ফেরকা হয়, তবে হানাফিরা নিশ্চয় দুযখী। আপনাদের এ-ফেরকা ছেড়ে দিয়ে মোহাম্মদী হওয়া উচিত। আর কোন্ ফেরকা বেহেশ্তী তাতে যদি আপনাদের সন্দেহ থাকে তবে আপনারা মুসলমান নন—আপনাদের কোন বন্দেগি কবুল হয় না। দীন-ইসলামের কথা বহুৎ সহজ কথা; এতে ঘোর-প্যাঁচ চলে না। এতে দিনকে দিন, রাতকে রাত-বলতেই হবে। না-ইধার না-ওধার-এ-রকম মোনাফেকি ইসলাম পছন্দ করে না।

গ্রাম্য অশিক্ষিত সরল-বুদ্ধি লোকেরা এই তর্কের জাল কাটিতে পারিল না। তাহারা দেখিল ঃ মযহাবের সওয়ালটাকে তাহারা এ যাবৎ যতটা সোজা মনে করিয়া আসিতেছিল, বাস্তবিক উহা তত সোজা নয়।

তাহারা বিশেষ ভাবনায় পড়িল।

মওলানা সাহেব বলিয়া যাইতে লাগিলেন ঃ আমি তসলিম করি, ওদেরকে সামনা-সামনি দুযখী বলে গাল দিয়ে ওদের মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। লেকেন দিলে-দিলে তাদেরকে দুযখী বলে না জানলে আপনাদের নিজেদের মযহাবে ইমাম পোখতা হবে না। যইফ-ইমান লোকের এবাদত আল্লাহর দরগায় কবুল হয় না। কাজেই আখেরাতে দুজখের আগুন থেকে বাঁচবার জন্য মোহাম্মদীকে আমাদের দুজখী জানতেই হবে। শুধু তাই নয়। আপনারা বেহেশ্তী ফেরকা; সুতরাং খোদার দরগায় আপনারা শরীফ। মোহাম্মদীরা দুজখী; সুতরাং খোদার তারা রযিল। রযিল লোক শরীফ লোকের আগে রাস্তা চলতে পারে না। যদি চলে এবং শরীফ লোক যদি বিনা-প্রতিবাদে রজিলের পিছনে যায়, তবে তাতে সেও রযিলের দরজায় নেমে যায়। সেইরূপ শরীফ লোকের পক্ষে রযিল লোকের সরদারি মেনে না নেওয়ার শানেও হাদিসে বহুৎ-বহুৎ খবর এসেছে। দুনিয়াবী শরাফতেরই যখন এত ইযযৎ, তখন দীনা শরাফতের কত ইযযৎ হওয়া উচিত, তা আপনারাই খেয়াল করুন। আপনারা দীনা শরীফ ফেরকা হয়েও দীনা রযিল ফেরকার সরদারি মেনে নিয়েছেন। আপনাদের মধ্যে ধনী বেশি, আপনাদের ফেরকায় আলেম বেশি, দুনিয়ায় প্রায় সমস্ত মুসলমানই এই ফেরকা-ভুক্ত। তবু আপনারা কেন মোহাম্মদীদের তাঁবেদারি করছেন? তাদের গ্রামেই স্কুল হবে, সেইখানেই সাহেব-সুবা আসবে, সেখানেই সব; আপনারা যেন কেউ নন। কেন? আপনারা এত জিল্লত কেন বরদাশত করবেন? আপনারা ইচ্ছা করলে এ গ্রামে কি স্কুল স্থাপন করতে পারেন না? সাহেব সুবা কি আপনাদের গ্রামে আসতে পারে না?

মওলানা সাহেব দীনা শরাফতের যুক্তি শ্রোতাদের মনে বিশেষ আসর করিতে না পারিলেও দুনিয়াবী শরাফতের শেষ দিকটার যুক্তিটা অধিকাংশের ভাল লাগিল। তার ফল ফলিল—হাটে মাঠে রাস্তাঘাটে বৈঠকখানায় সর্বত্র দিনরাত এই আলোচনাই চলিতে লাগিল।

## চার

মোহাম্মদীর সরদার-মৌলবী সাহেবের কানে এ-খবর পৌছিল।

তিনি জন-চার -পাঁচেক আসহাবা লইয়া তীরবেগে গ্রামে তশরিফ আনিলেন। মযহাবী কলহে তাঁহার ইচ্ছা নাই, এই অভিমত প্রকাশ করিয়াও তিনি মওলানা সাহেবের পিছনে ধাওয়া করিলেন। মওলানা সাহেবের নিকট সদলবলে হাজির হইয়া তিনি বলিলেন ঃ আপনি মোহাম্মদীগণকে দুজখী বলেছেন। আপনার কথা হাদিস কোরআন থেকে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে।

মওলানা সাহেব ইহাই চাহিতেছিলেন। তিনি বলিলেন ঃ আলহামদুলিল্লাহ, আমি প্রস্তুত।

বাহাসের দিন-তারিখ ধার্য হইয়া গেল।

গ্রামের তরুণরা প্রবীণদের ধরিল; বাহাস হইলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমানিন্য হইবে; তাতে স্কুলের ক্ষতি হইবে।

দুই-একজন মাতব্বর গ্রামে গ্রামে হাঁটিয়া বাহাসের অপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টাও করিলেন।

কিন্তু সমস্ত লোক তখন বাহাসের নামে উন্মত্ত। অনেকে তাঁহাদের কথা শুনিলই না। যাহারা শুনিল তাহাদের অনেকেই তর্ক করিয়া বাহাসের সমর্থন করিল; যাহারা মুখে মুখে সায়ত্ত দিল, তাহারাও তলে তলে বাহাসের জন্য চাঁদা দিল।

গ্রামময় সাজ-সাজ সাড়া পড়িয়া গেল। চাঁদা আদায়ের ধুম লাগিয়া গেল। আশে-পাশের দশ-বারখানা গ্রাম হইতে উভয় পক্ষে দশ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়া গেল। যাহারা অসচ্ছলতাহেতু স্কুলের তহবিলে এক পয়সাও চাঁদা দিতে পারেন নাই, নিতান্ত গরীব বলিয়া যাহারা মুষ্টিভিক্ষার দায় হইতেও রেহাই পাইয়াছিল, তাহারাও বাহাসের তহবিলে একটাকা চাঁদা দিয়া ফেলিল।

বাহাসের সমস্ত ঠিক হইয়া গেল।

এই মর্মে শর্তনামা দস্তখত ও রেজিস্টারী হইল ঃ বাহাসের যে পক্ষ হারিবে সদলবলে তাহারা জয়ী পক্ষের মযহাব গ্রহণ করিবে।

বিভিন্ন স্থানের উভয় সম্প্রদায়ের বড় বড় মওলানাকে দাওয়াৎ করা হইল। কোন্ মওলানার নযরানা ও গাড়ি ভাড়া বাবদ কত টাকা খরচ হইবে, তারও একটা বাজেট তৈয়ার হইয়া গেল। নযরানা ও গাড়ি ভাড়ার টাকা অগ্রিম পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

সর্বত্র উৎসাহের একটা তুফান বহিতে লাগিল।

প্রথম-প্রথম যাহারা বাহাসের বিরুদ্ধতা করিয়াছিল, শেষদিকে তাহারাও ভীষণ উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়িল।

তিন-চার দিন আগে হইতেই উভয় পক্ষের আলেমগণ সদলবলে তশরিফ আনিতে

লাগিলেন। গ্রাম বড়-বড় পাগড়িতে ভরিয়া গেল। দেদার পোলাও-কোর্মা চলিতে লাগিল। পোলাও-কোর্মার খুশবুঁতে গ্রামের দীন-দরিদ্র ক্ষুধাকাতর হতভাগারা বাবুর্চিখানায় উঁকি মারিয়া মারিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতে লাগিল।

বিকালের দিকে মওলানারা দলে-দলে গ্রামের রাস্তায় ও মাঠে যখন বেড়াইতে বাহির হইতেন, তখন এই সমস্ত মুজাহেদিনে-ইসলামের সাদা পাগড়ি দেখিয়া মনে হইত জার্মান যুদ্ধের প্রাক্কালে গোরা সৈন্যরা কুচ-কাওয়াজ করিতেছে।

নির্ধারিত দিনের সকাল হইতেই প্যান্ডেল রচনা কার্য শুরু হইল। বিরাট শামিয়ানা খাটান হইল। যাত্রা গানের মঞ্চের ন্যায় আসরের মাঝখানে



বাবুর্চি খানায় উঁকি মারিয়া-মারিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতে লাগিল

বিরাট মঞ্চ প্রস্তুত হইল। মঞ্চের দুই পাশে দুই সম্প্রদায়ের যথাক্রমে মুনশী মৌলবী, মওলানা ও হযরত মওলানাদের জন্য পদমর্যাদা অনুযায়ী আসন নির্দিষ্ট হইল।

দুই সম্প্রদায়ের গ্রাম্য মাতব্বরদের জন্য সম্মুখ ভাগে দুইটি পৃথক সতরঞ্চি বিছান হইল।

তার পিছনে সর্বসাধারণের বসিবার জন্য চাটাইর উপর ছালার চট দেওয়া হইল।

মোটকথা, মহফিলে ইসলামী শান-শওকতের কোন কমতি হইল না।

## পাঁচ

যথা সময়ে সভা বসিল।

বহুলোকের সমাগম হইল।

বহু পুলিশসহ থানার বড় দারোগা সাহেবও উপস্থিত হইলেন। সংখ্যায় পুলিশের লাল পাগড়ি ও মওলানা সাহেবদের সাদা পাগড়িতে প্রতিযোগিতা চলিলেও আকারে মওলানা সাহেবদের পাগড়িই ইসলামের জয় ঘোষণা করিল।

তরুণদের নেতা সাদতই কেবল শেষ পর্যন্ত বাহাসে উৎসাহিত হইয়া উঠে নাই।

সে আগের দিন শহরে গিয়া জিলায় মুসলমান স্কুল ইন্‌স্পেক্টরকে অনেক বলিয়া-কহিয়া বাহাসের সভায় উপস্থিত করিল। দারোগা সাহেবও মুসলমান ছিলেন। তাঁহাকেও দুই-এক কথা বলিতে রাজি করিল।

ফলে সভা শুরু হইবার আগে স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর সাহেব ও দারোগা সাহেব দু'এক কথা বলিবার সুযোগ পাইলেন। তাঁহারা উভয়ে সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও সামাজিক শান্তির দিক দিয়া এবং নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি স্থায়িত্বের দিক দিয়া বাহাসের বিষময় ফলের কথা নানা যুক্তিতে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। জনতার উপর তার খানিকটা ক্রিয়াও হইল।

কিন্তু পর পর উভয়পক্ষের দুইজন মওলানা সাহেব উঠিয়া বলিলেন ঃ এ সব শরিয়তের মসলা, এসব ব্যাপারে কথা বলিবার তাঁহাদের কোন অধিকার নাই। দুনিয়াবী মসলার উপর দীনি মামলার ফয়সলা করা ইসলামের খেলাফ। যে সমস্ত মুজাহেদিন ইসলামের জন্য জেহাদ করিয়াছেন, তাঁহারা দুনিয়ার ভালমন্দ চিন্তা করেন নাই।

বক্তৃতায় হানাফী মওলানা সাহেব ইন্‌স্পেক্টর সাহেবকে বেনামাযী বলিয়া তাম্বিহ করিলেন এবং মোহাম্মদী মওলানা সাহেব দারোগা সাহেবের দাড়িহীনতা লইয়া রসিকতা করিলেন।

বাহাস হউক, জনতা এই অভিমত প্রকাশ করিল।

সাদতের তরুণ প্রাণে আর সহ্য হইল না। সে নিজেই বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইল। প্রাণস্পর্শী ভাষায় সে হিন্দুদের শুদ্ধিসংগঠনের কথা বলিয়া তার সঙ্গে মুসলমানদের আত্মকলহের তুলনা করিল। অশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ করিয়া সে 'ওয়াতাসিমু বিহাব্‌লিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর রশি ধরিবার সেই অতি পুরাতন আয়াতটি পর্যন্ত আবৃত্তি করিল।

কিন্তু কেহ তাহার কথা শুনিল না।

মওলানারা তাহাকে বেতমিষ বলিয়া বসাইয়া দিলেন।

বাহাসের অন্যতম শর্তরূপে নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবে স্থানীয় জমিদারের হিন্দু নায়েব মহাশয় সভার বিচারক সভাপতি। তিনিও সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াই প্রথমে উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের পক্ষে দু'চার কথা বলিতে শুরু করিলেন।

কিন্তু বাধা দিয়া মওলানাদের দু'চারজন সমস্বরে বলিলেন ঃ এই কাজের জন্য তাহাকে সভাপতি করা হয় নাই।

তিনি অগত্যা নিরস্ত্র হইলেন এবং বাহাস আরম্ভের আদেশ দিলেন।

বাহাস শুরু হইল।

প্রথমে দণ্ডায়মান হইলেন হানাফী পক্ষ হইতে মওলানা দুর্‌রায়েগায়ের মোকাল্লেদিন সাহেব। তিনি নাকি তাঁহার বাহাসে গায়েব-মোকাল্লেদদিগকে ভাষার চাবুক মারিতে পারিতেন এবং বহু বাহাসের সভায় তা করিয়াছেনও। এটা তাহার নিজেরই দাবি; তাই তিনি নিজেই এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই ভক্তদের মধ্যেও তিনি ঐ নামেই পরিচিত। তিনি দাঁড়াইয়া যথারীতি দাড়িতে হাত বুলাইয়া হামদু-সানা পাঠ করতঃ এরশাদ ফরমাইলেন ঃ আমার প্রথম সওয়াল এই যে, গায়ের-মোকাল্লেদরা যে নিজেদের মোহাম্মদী বলে, এ কোন মোহাম্মদ—জনাব পয়গম্বর সাহেব, না আবদুর ওহাবের পুত্র মোহাম্মদ?

সওয়াল শেষ করিয়া দুর্‌রা সাহেব দাঁড়াইয়া নিশ্চিত বিজয়-গর্বে মুচকি হাসিতে লাগিলেন।

মোহাম্মদী তরফ হইতে মওলানা দহ্‌শতে-মোকাল্লেদিন সাহেবই জওয়াব দিতে দণ্ডায়মান হইলেন। ইনি স্বীয় ভক্তদের মধ্যে ঐ নামেই বিখ্যাত, কারণ তাঁহার দহ্‌শতে হানাফীরা থরথরি কম্পমান। তিনি মওলানা দুর্‌রার সওয়ালের কোন জওয়াব না দিয়া পাল্টা সওয়াল করিলেন। বলিলেন ঃ আপনি আগে কোরআন শরীফ থেকে মযহাব সাবেত করুন।

মওলানা দুর্‌রা চিৎকার করিয়া বলিলেন ঃ আমার সওয়ালের জওয়াব দিন।

মওলানা দহ্‌শত সমান জোরে চিৎকার করিলেন ঃ আমার সওয়ালের জওয়াব দিন।

কেহ কাহারও জওয়াব দিলেন না।

উভয়ে বলিলেন ঃ অপর পক্ষ মোনতেক মানিতেছে না, কাজেই এভাবে বাহাস চলে না।

বলিলেন বটে চলে না, কিন্তু বাহাস চলিতে লাগিল। অর্থাৎ কাহারো কথা কেহ না শুনিয়া উভয়েই একসঙ্গে কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। কেহ কিছু প্রমাণ করিলেন না বটে, কিন্তু একপক্ষ যে রাফেযী, খারেজী, দুযখী, জাহান্নামী এবং ইহাঁতকে কাফের, একথা অপর পক্ষ খুব জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

মাঝে মাঝে উভয় পক্ষের অতি উৎসাহী কেহ-কেহ দুই মওলানার পিছনে জোর দিবার চেষ্টা করিল। ফলে একসঙ্গে একাধিক তার্কিকের মধ্যে তর্ক শুরু হইল। ক্রমে হযরত মওলানাদের সঙ্গে-সঙ্গে মওলানারা তারপরে মৌলবীরা এবং অবশেষে মুনসী সাহেবেরাও তর্কে যোগদান করিলেন।

সভাপতি চিৎকার করিয়া গলা ফাটাইলেন। কেহ তাঁহার কথা শুনিল না।

অবশেষে বিরক্তি ভরে তিনি কখন যে সভা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন বাহাসরত মওলানারা তা টেরও পাইলেন না।

বিষম কোলাহলের আকারে বাহাস চলিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে গ্রামের মাতব্বর সাহেবরাও তর্ক-যুদ্ধে অবতরণ করিলেন।

মাতব্বররা তর্কে অবতরণ করায় জনতাও নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল।

সুতরাং তর্ক অধিকক্ষণ মুখে সীমাবদ্ধ থাকিল না। হাত মুখের স্থান অধিকার করিল। হাতাহাতি কিলঘুষি বেদেরেগ চলিতে লাগিল।

শুধু হাতে আর কতকক্ষণ বাহাস চলে? কাজেই দুই পক্ষই সামিয়ানার খুঁটি ভাঙ্গিয়া বাহাস চালাইতে লাগিল। এ সবেও যখন অকুলান হইল, তখন উভয় পক্ষই বাড়ি হইতে রশদ সরবরাহ করিতে লাগিল।

মওলানা সাহেবরা এইরূপ বেদাঅতি ধরনে বাহাস করিতে রাজি ছিলেন না বলিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিলেন।

কিন্তু জনতার বাহাস চলিতে লাগিল।

পুলিশ কোন মতেই শান্তিরক্ষা করিয়া উঠিতে পারিল না। কারণ জেহাদরত এই বিরাট জনতার সাহসের সামনে ধর্মহীন ঐ গুটিকতক পুলিশের সাহস কিছুতেই যথেষ্ট বিবেচিত হইল না।

ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া দারোগা সাহেব কোতোয়ালিতে খবর দিতে নিজেই চলিয়া গেলেন।

দারোগা সাহেবের অনুপস্থিতিতে পুলিশরা দূরে দাঁড়াইয়া শান্তিরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে বাহাস থামিল। ততক্ষণ উভয় পক্ষে কয়েকজন হত এবং বহু আহত হইয়াছে। সুতরাং পুলিশের কর্তব্য সাধনে বিশেষ অসুবিধা হইল না। ইতিমধ্যে লাল পাগড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। তাহারা তখন সদম্ভে বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া গ্রেফতার ও খানাতল্লাশ করিতে লাগিল।

দেখা গেল, লাল পাগড়ির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম একদম সাদাপাগড়ি শূন্য হইয়া গিয়াছে।

গ্রামের বহুলোককে গ্রেফতার করিয়া হতহতদের লাশ আসামিদের কাঁধে তুলিয়া পুলিশ যে রাস্তায় কোতোয়ালির দিকে রওয়ানা হইল, সেটা ছিল হিন্দু পাড়া। তখন সে পাড়ায় স্বামী বিবাদানন্দের সভাপতিত্বে হিন্দুদের এক বিরাট সভায় বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও অস্পৃশ্যতা বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইতেছিল। সভার লোক খানিকক্ষণ সভার কাজ স্থগিত রাখিয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া কোমড়ে-দড়ি-বাঁধা-কাঁধে-লাশের-ডুলি-বওয়া মুসলমানদের মিছিল দেখিল।

দীর্ঘদিন ধরিয়া পুলিশের তদন্ত চলিল। খানাতল্লাশে গ্রামকে-গ্রাম চাষ করিয়া ফেলিল। মেয়েদের এ-বাড়ি হইতে ও-বাড়ি টানা হ্যাঁচড়া করা হইল; পুলিশের সামনে তাহাদের বে-আবরু করা হইল। ধান-চাউল, লবণ-চিনি একাকার হইল।

সরেজমিনে তদন্ত খানাতল্লাশ ও জবানবন্দির হিড়িক যখন কাটিল, তখন সদরের মামলা শুরু হইল।

বৎসরাধিককাল মামলা চলিল। উভয় পক্ষই পুলিশ ও উকিলের পায়ে বহু টাকা

ঢালিল। কেহ জমি বিক্রয় করিল, কেহ বাড়ি বিক্রয় করিল, কেহ কেহ সর্বস্ব খোয়াইল; এবং পরিমাণে গ্রামের প্রায় সকলেরই অল্প-বিস্তর জেল-জরিমানা হইল।

যাহাদের জরিমানা হইল, তাহারা কষ্টে-সৃষ্টে জরিমানা আদায় করিল। যাহাদের জেল হইল, তাহারা আপিল করিল। আপিলে সর্বস্বান্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত জন-পঞ্চাশের কারাদণ্ড বহাল থাকিল।

নির্ধারিত দিনে যখন গ্রামের যুবক-বৃদ্ধ প্রায় পঞ্চাশজন কয়েদী আত্মসমর্পণের জন্য সদরের দিকে রওয়ানা হইল, তখন হিন্দু-পাড়ায় সর্বজনীন দুর্গাপূজা হইতেছিল। এতকালের অস্পৃশ্যরাও ব্রাহ্মণ-কায়েতের সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করিতেছিল।

সাদত একটা নদীর পারে স্কুল-গৃহের ছায়ায় বসিয়া সেইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। সে একবার কারাগামী মুসলমানদের মিছিলের দিকে, আরেকবার নদীর ওপারে সর্বজনীন পূজারত হিন্দুদের দিকে এবং সর্বশেষে নিজের মাথার উপরকার সদ্য-পরিত্যক্ত স্কুল-গৃহটির দিকে চোখ ফিরাইল।

একবিন্দু অশ্রু অতি ধীরে-ধীরে তাহার গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ওদিকে উভয় সম্প্রদায়ের মওলানার বাহাস সভার বিবরণ দুইটি পৃথক পুস্তিকা বাহির করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন। দেখা গেল, উভয় পক্ষের পুস্তিকাতেই দাবি করা হইয়াছে যে বাহাসে তাহাদেরই জয় হইয়াছে।

# বিদ্রোহী সংঘ

খেলাফত আন্দোলনে সমগ্র দেশটা যখন থৈ-থৈ করিয়া উঠিয়াছিল, তখন আমি পরম উৎসাহেই উহার নিন্দা করিয়াছিলাম। তখন আমি সবেমাত্র বি. এ. পাশ করিয়া কলেজ হইতে বাহির হইয়াছি। ডেপুটিগিরির স্বপ্নে আমি তখন বিভোর।

জালিয়ানওয়ালার ডায়ারী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের বন্যায় যখন ভারতবর্ষ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, তখনো আমি নেতাদের খামখেয়ালি বাড়াবাড়িতে বিরক্ত প্রকাশ করিয়াছিলাম। তখনো আমি প্রশংসাপত্রের টাইপ করা নকলের বস্তা-বগলে সাহেব-সুবার বাড়ি-বাড়ি ঘুরা-ফেরা করিয়া আশা পাইতেছি।

তারপর যখন ইংরাজ সরকার বিশ হাজার ভারতবাসীকে কারানিক্ষেপ করিলেন, তব্ ভি হাস কুচ্ না কাহা। তখনও আমি কর্মখালি পাঠের জন্য দৈনিক কাগজে এবং চাকুরির দরখাস্তের জন্য ডাক-টিকিট ক্রয় বাবত দু'হাতে খরচ করিতেছি।

এমন কি যখন বাড়ির কাছে চাঁদপুর, সলঙ্গার হাট হইতে আরম্ভ করিয়া কুলকাঠি পর্যন্ত অনেক জায়গায় অনেক অকাণ্ড-কুকাণ্ড ও হত্যাকাণ্ড এক রকম চোখের সামনেই হইয়া গেল, তখনো আমি ইংরাজ ভক্তিতে অবিচলিত থাকিয়া নিরুদ্বেগে ইংরাজের চাকুরির চেষ্টা করিতে থাকিলাম।

কিন্তু অবশেষে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। আমার ভিতরে ইংরাজ-বিদ্বেষে বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল সেইদিন- পুনঃ পুনঃ চাকুরির ভরসা দিয়াও যেদিন জেম্‌স সাহেব আমাকে তাঁহার অফিস গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য তাঁহার আরদালিকে হুকুম দিয়া বসিলেন। আমি সাহেবটার অভদ্রতায় ভয়ানক চটিয়া গিয়াছিলাম। সুতরাং আরদালি আসিয়া পৌঁছিবার আগেই আমি বাহির হইয়া আসিলাম। ফলে আরদালি আমার কেশ-স্পর্শ করিতেও পারিল না। কিন্তু আমি বুঝিলাম ঃ ইংরাজ জাতটার মধ্যে সত্যি সত্যি কোন বিচার নাই।

ইহার উপর বিনা টিকিটে ট্রামে চড়ার অপরাধে যেদিন গোরা চেকার আমাকে গোরা সার্জেন্টের হাতে সোপর্দ করিয়া এক টাকা জরিমানা লাগাইল, সেইদিন আমার মধ্যে বিদ্রোহের রক্ত টগবগ করিয়া উঠিল।

স্বরাজের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহ থাকিল না। জরিমানার টাকাটা দিয়া পুলিশ-কোর্ট হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, সার্জেন্টটা আমার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিতেছে। আমি ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। চিৎকার করিয়া বলিলাম;

শোন ইংরাজ,
আজ হতে আমি বিদ্রোহী উন্মাদ!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া
গিয়াছে সব বাঁধ।'

আমি মুক্ত, আমি সত্য, আমি বিদ্রোহী সৈন্য!
আমি ধন্য! আমি ধন্য!!
মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত,
আমি সেই দিন হব শান্ত।
যবে চাকুরির আশে বাঙালি ফিরিঙ্গীর পায়ে ধরিবে না!
আর ট্রাম কোম্পানি ভাড়া চাহিবার দুঃসাহস করিবে না।

সার্জেন্টের দিকে চাহিয়া দেখিলাম ঃ তাহার হাসি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, চক্ষু বড় হইয়াছে। ইংরাজ জাতির অভদ্রতায় আমি ইতিপূর্বেই নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম। তাই সেখানে আর দেরি করিলাম না; দ্রুতগতিতে রাস্তায় জনতার মধ্যে সান্ধাইয়া পড়িলাম। কিন্তু তার পূর্বে গোরাকে শুনাইয়া 'আমি ফিরিঙ্গী বুকে একে দিই পদচিহ্ন' বলিয়া সে-কার্যে আমার যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ আপাতত ধরণীর বুকেই বাম পায়ের গোড়ালি চিহ্ন রাখিয়া আসিলাম।

বাঙালির ক্রোধ তালপাতার আগুনের মতই ক্ষণস্থায়ী বলিয়া একটা বদনাম আছে। আমিও বাঙালি। অথচ আমি ইংরাজ জাতির উপর সত্যই চটিয়া গিয়াছিলাম, সুতরাং বাঙালির জাতির এই দুর্নাম ঘুচাইবার জন্য আমি আমার ক্রোধটাকে তাজা রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

আমি স্থির করিলাম। ইংরাজ জাতিকে হয় ভারতবর্ষ হইতে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিব, নয় ত উহাদিগকে আমাদের আরদালি করিয়া রাখিব। এই মতলবে আমি এতই কঠোর হইয়া উঠিলাম যে, হাজার অনুরোধ-উপরোধও আমার মনে ইংরাজের প্রতি দয়ার উদ্রেক হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিল না।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যায়, সে ভাবনায় আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। পূর্বে স্থির করিয়াছিলাম, জেম্‌স সাহেবের নিকট চাকুরির শেষ চেষ্টা করিয়া বিফল হইলে বাড়ি ফিরিয়া আপাতত কিছুদিন বিশ্রাম করিব এবং বাড়িতে আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি দেখিলে গ্রাম্য কোন স্কুলে মাস্টারি করিব; কিন্তু ইংরাজ তাড়াইবার এই নূতন দায়িত্ব কাঁধে পড়ায় আমার প্রোগ্রাম চেঞ্জ করিতে হইল- আপাতত কিছুদিন কলিকাতায় থাকাই স্থির করিলাম।

প্রথমে নজর পড়িল স্বভাবতই কংগ্রেসের উপর। তাই কংগ্রেস অফিসে হাঁটাহাঁটি করিলাম, কংগ্রেস নেতাদের সহিত আলাপ করিলাম, কংগ্রেসের উদ্দেশ্যসমূহ ভাল করিয়া অধ্যায়ন করিলাম। কিন্তু হতাশ হইলাম। বুঝিলাম ঃ ইংরাজ তাড়ান ইহাদের কর্ম নয়। ইহারা অন্যসব ব্যাপারে ততটা নন-ভায়লেন্ট না হইলেও ইংরাজ-তাড়ানোর ব্যাপারে সত্য সত্যই ননভায়লেন্ট।

রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধায়োজন ইত্যাদি বড় বড় অপরাধে যাঁহাদের দীর্ঘদিন কারাদণ্ড হইয়াছিল, এমনও দুই-একজন সদ্যমুক্ত বিপ্লবী নেতার সঙ্গে দেখা করিলাম। দেখিলাম ঃ ষড়যন্ত্রে তাঁহারা মজবুত বটে, কিন্তু তা রাজার বিরুদ্ধে নয়; নিজেরা

সহোদরের বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধও তাঁহারা করেন বটে, কিন্তু তা রাজার সঙ্গে নয়, স্ত্রীর সঙ্গে- অধিকন্তু তা বাক্-যুদ্ধ!

সশস্ত্র বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বহুদিন স্টেটপ্রিযনাররূপে যাঁহারা মান্দালয় ও বক্‌শা জেলে বাস করিয়া পীড়ার অজুহাতে সম্প্রতি মুক্তি পাইয়া আসিয়াছেন, এমনও অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমার কথা শেষ হইবার আগেই তাঁহারা আমাকে "এজেন্ট-প্রভোকেটর" বলিয়া হাঁকাইয়া দিলেন।

দেখিলাম ঃ সারা বাংলায় আমি ছাড়া ইংরাজের সত্যিকার শত্রু আর একজনও নাই। ইংরাজ তাড়াইয়া দেশ স্বাধীন করা যেন আমার একারই দায়িত্ব, আর সবাই যেন ইংরাজের অধীনে রাম-রাজত্বে বাস করিতেছে।

নেতাদের উপর বিষম রাগ হইল। দেশবাসীর নির্বুদ্ধিতায় আমি একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। বাঙালির মেষ স্বভাবের উপর ভয়ঙ্কর চটিয়া গেলাম। মনে হইল ঃ হাতে ক্ষমতা থাকিলে ইংরাজের আগে এই বাঙালি জাতিটাই নির্মূল করিয়া ফেলিতাম।

আপাতত কোনটাই সম্ভব ছিল না। তাই স্থির করিলাম ঃ বাঙলা ত্যাগ করিয়া লাখনোয়ে মওলানা হযরত মোহানীর কাছে, কিম্বা নাগপুরে ডাঃ মুঙ্গের কাছে চলিয়া যাইব।

দেশত্যাগের মতলব স্থির করায় মনটা একটু খারাপ হইয়া গেল। তাই গড়ের মাঠে শেষবারের মতো বড়াইতে গেলাম।

উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক-ওদিক অনেকক্ষণ বেড়াইয়া সন্ধ্যা লাগে-লাগে অবস্থায় একটা নির্জন স্থানে বসিয়া পড়িলাম। আকাশ-পাতাল অনেক ভাবিতে লাগিলাম।

একটি ভদ্রলোক আসিয়া আমার পাশে বসিয়াই কোনও ভূমিকা না করিয়া নিতান্ত অপ্রতিভভাবে বলিলেন ঃ জনাবের নিকট ধূমপানের ব্যবস্থা আছে কি?

আমি ইংরাজের উপর চটিয়া যাওয়ার পর হইতে সম্প্রতি সিগারেট বর্জন করিয়াছিলাম, এবং খাইতে পারিতাম না বটে, কিন্তু বিড়ি কিনিয়া পকেট ভর্তি করিয়া রাখিতাম।

বলিলাম ঃ সিগারেট আমি বয়কট করেছি ঃ বিড়ি আছে, দেব?

ভদ্রলোক দন্ত বিকাশ করিয়া আর একটু কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া বলিলেন ঃ বিড়িই আমি ভালবাসি, দিন।

আমি তাঁহার হাতে বিড়ির আস্ত প্যাক্‌টাই দিয়া দিলাম।

ভদ্রলোক একটা বিড়ি খুলিয়া প্যাক্‌টা বেঞ্চিতে নিজের কাছ ঘেঁষিয়া রাখিয়া বলিলেনঃ ঃ দেয়াশলাইটাও নিশ্চয় আছে আপনার কাছে?

আমি পকেটে হাত দিয়া দেয়াশলাইটাও তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি বিড়িটা ধরাইয়া বিড়ির প্যাকের উপর দেয়াশলাইটা রাখিয়া দিয়া বলিলেন ঃ আপনি সিগারেট বয়কট করেছেন? বড্ড ভাল করেছেন, সাহেব। ঐ সব রাবিশ দিয়েই ত ইংরাজরা আমাদের দেশটা লুটে খাচ্ছে।

আমি ঈষৎ হেলান দিয়া বসিয়াছিলাম, একেবারে সোজা হইয়া বসিলাম। ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন ঃ বাঙালি জাত ভাল নয়, নইলে বয়কটটা সফল করতে পারলে শ্বেতকুষ্ঠ-মুখো শালাদের মুখ দু'দিনেই একেবারে কালাজ্বরের রোগীর মতো হয়ে যেত!

তাই ত! আমার ভাবের ভাবুক অন্ততঃ একজন লোকও বাঙলায় আছে? আমি পুলকে অধীর হইলাম। ইংরাজের বিরুদ্ধে আমার মুখ খুলিয়া গেল। এতদিনে রুদ্ধ উচ্ছ্বাস ছাড়া পাইয়া আজ নিজেকে একেবারে নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিল।

ভদ্রলোক ছিলেন সত্যসত্যই আমারই মতো ইংরাজ-বিদ্বেষী। তিনি শুধু আমার কথায় সায় দিলেন না—আমার কথার সমর্থনে অনেক উদাহরণও দিলেন! দেখিলাম : ইংরাজ তাড়ান ব্যতীত আমাদের মঙ্গল নাই, এ বিষয়ে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে একমত।

এ বিষয়ে আমি যে সমস্ত বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াছি, সে সমস্ত কথা ভদ্রলোকের নিকট খুলিয়া বলিলাম।

ভদ্রলোক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন ঃ আপনি ঢাকার বিদ্রোহী দলের নাম শোনেন নি?

আমি অপ্রতিভভাবে বলিলাম ঃ জি না, আমি খবরের কাগজ পড়ি না।

ভদ্রলোক বলিলেন ঃ এটা খবরের কাগজের লেখা নয়—সত্যি কথা। ঢাকায় এক বিদ্রোহী দলের সৃষ্টি হয়েছে। রুশিয়ার বলশেভিকরা ওদের আদর্শ বাঙলা সরকার ওদের ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠেছেন। ভারত-সরকার সমর-বিভাগের খরচ বাড়াবার মতলব করেছেন। আসামে একটা সামরিক ঘাঁটি তৈরির আয়োজন চলছে। ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল আপাতত ঢাকায় বিদ্রোহীদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

আমি উৎসাহে লাফাইয়া উঠিলাম। বলিলাম ঃ বলেন কি সাহেব এ-সব কথা কি সত্য? ইংরাজ তাড়াবার সত্যিকার একটা চেষ্টা হচ্ছে তা হলে?

প্রবোধ দিয়া ভদ্রলোক বলিলেন ঃ হচ্ছে বই কি! দেশ কি আর আগেকার মতো ঘুমিয়ে আছে?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ আপনিও ইংরাজের শত্রু, তবে ঐ দলে ভর্তি হন নি কেন?

ভদ্রলোক চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করিয়া গলার সুর নামাইয়া বলিলেন ঃ কে বলেছে আমি ভর্তি হই নি? আমি ঐ দলেরই একজন নগণ্য সেবক। আপনার মতো লোক খুঁজতেই আমার কলকাতায় আসা।

ভদ্রলোকের সহিত করমর্দন করিয়া বিদায় হইলাম এবং পরদিন ঢাকার মেলে চড়িয়া বসিলাম।

## দুই

সরকারি চাকুরিয়াদের আমি দুই চক্ষে দেখিতে পারিতাম না। কাজেই অন্য কোন বন্ধু থাকিলে আমি আমার পুরাতন বন্ধু সরকারি স্কুলের শিক্ষক আফ্‌তাব হোসেনের বাসায় উঠিতাম না।

অনেকদিন পরে আফ্‌তাব হোসেন আমাকে পাইয়া খুব আদর-অভ্যর্থনা করিল। আমি আমার উদ্দেশ্যের কথা গোপন রাখিলাম। কারণ তাহার খাইয়া তাহাদেরই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে চাই, একথা তাহার নিকট বলিতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকিল। আফতাবও কোন কথা জিজ্ঞাস করিল না।

আমি গোপনে বিদ্রোহী সংঘের আড্ডার ঠিকানা যোগাড় করিলাম। শুনিলাম ঃ রবিবার দিন দুপুরে এবং অন্যান্য দিন সন্ধ্যার পর সংঘের বৈঠক বসে।

সেদিন রবিবার। স্থির করিলাম ঃ খাওয়া-দাওয়ার পর আফ্‌তাব যখন তার সহধর্মিণীকে লইয়া বিশ্রাম করিবে, সেই ফাঁকে আমি বাহির হইয়া পড়িব।

কিন্তু সেদিকে আফতাবের মোটেই গা দেখা গেল না। সে খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া তাহাদের ক্লাবে যাইতে আমাকে চাপিয়া ধরিল। আমি মাথা ফস্‌কাইবার অনেক চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে ছাড়িল না। অগত্যা আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ তোমাদের ক্লাব কোথায়?

সে যে-ঠিকানা বলিল, তা শুনিয়া আমি চিৎকার করিয়া বলিলাম ঃ সে যে বিদ্রোহীদের আড্ডা!

আফ্‌তাব হাসিয়া বলিল ঃ লোকে তাই বলে বটে!

আমি ঢোক গিলিয়া বলিলাম ঃ তুমি বিদ্রোহী-দলভুক্ত? তুমি যে সরকারি চাকুরে!

আফ্‌তাব আরও হাসিতে লাগিল। বলিল ঃ কেন সরকারি চাকুরেরা কি মানুষ নয়?

উভয়ে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। যে বিদ্রোহী দলের লোক গবর্নমেন্টের কাজে পর্যন্ত ঢুকিয়াছে সে-দল কত শক্তিশালী, তা ভাবিয়া পুলকে আমার রোমাঞ্চ হইল। কল্পনা-নেত্রে দেখিতে লাগিলাম; আমি টেটের্থ সাহেবের জায়গায় কলিকাতায় কমিশনার হইয়া বসিয়াছি, আর জেম্‌স সাহেব আমার নিকট চাকুরির উমেদারি করিতে আসিয়াছে. আমার আরদালি আমার হুকুমে জেম্‌স্‌কে বারান্দার খুটির সঙ্গে বাঁধিয়া জুতা-পেটা করিতেছে আর সেই কুষ্ঠ-মুখো সার্জেন্টটা? অত তাড়াতাড়ি সে বেটার উপযুক্ত শাস্তি কল্পনা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যথা সময়ের জন্য সে ভাবনা রাখিয়া দিলাম। শুভদিনের [illegible] গরম হাওয়া আমার গাত্র স্পর্শ করিল।

আমি খোদার উদ্দেশ্যে মাথা নত করিলাম।

পথে যাইতে যাইতে আফ্‌তাব এক মুদি দোকান হইতে দু'পয়সার দু'পুরিয়া চিনি কিনিয়া এক পুরিয়া আমাকে দিল এবং অপরটি নিজের পকেটে রাখিল।

আমি বিস্ময়ে বলিলা ঃ চিনি দিয়ে কি হবে?



আরদালি আমার হুকুমে জেম্‌স্‌কে জুতো-পেটা করিতেছে।

আফ্‌তাব বলিল ঃ আমাদের দলের প্রধান উদ্দেশ্য প্রথা ও সংস্কারের দাসত্ব থেকে মানুষের মানসিক মুক্তি সাধন।

আমি বলিলাম ঃ সাধু উদ্দেশ্য। এই ত চাই। কিন্তু এর সঙ্গে চিনি কেনার সম্বন্ধটা কি, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না।

আফতাব গভীরভাবে বলিল ঃ আমাদের ক্লাবে চা খাওয়া হয়ে থাকে; তাই বলে চা খাওয়ার নিয়ম আছে, একথা বলতে পার না। কারণ কোন নিয়ম-কানুন আমরা মানি না। নিয়ম-কানুন, আইন-শৃঙ্খলা ও বিধি-নিষেধ নামে মানুষের আত্মার স্বাধীনতার পরিপন্থী যেসব গতানুগতিকতা আছে, এসব পদদলিত করাই আমাদের সংঘের উদ্দেশ্য।

আমি বলিলাম ঃ এর সঙ্গে চা খাওরার সম্বন্ধটা কি হল?

আফ্‌তাব অসহিষ্ণুভাবে বলিল ঃ আগে শোনোই না। আমাদের দলে চা খাওয়া হয়ে থাকে বটে, কিন্তু তাতে দুধ-চিনি খাওয়ার নিয়ম নেই। কারণ আমাদের মনে ওটা একটা প্রথা, একটা নিয়ম, একটা গতানুগতিকতা। নিয়ম মাত্রেই বাঁধন। চায়ে চিনি খাওয়া একটা নিয়ম। সে নিয়ম ভাঙাই আমাদের আদর্শ। কিন্তু আমরা আজও সম্পূর্ণ সংস্কার মুক্ত

হতে পারিনি বলে চিনি ছাড়া চা খেতে পারি না। তাই বলে দলের আদর্শও নষ্ট করতে চাই না। সে জন্য দলের মেম্বররা আড্ডায় যাওয়ার সময় পকেটে চিনি নিয়ে যায়। অবশ্য চিনির দামটা মাসিক চাঁদা থেকে বাদ পেয়ে থাকে। এর উপর যাদের সামর্থ আছে, তারা কন্‌ডেনস্‌ড্‌ মিল্কও নিয়ে যায়; আমি কিন্তু দলের আদর্শের অতটা বিরুদ্ধতা করার আবশ্যকতা বোধ করি না। আমরা চিনি খাই বটে, কিন্তু দলের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনহেতু সেটা সকলে অতি গোপনে খেয়ে থাকি। এই যে আমরা এসে পড়েছি।- বলিতে বলিতেই আমরা একটি মাঝারি রকমের একতালা বাড়ির গেটে উপনীত হইলাম।

বাড়িটা আগে ভাল ছিল বলিয়াই বোধ হইল; সামনে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। সেটাতে নানা প্রকার আগাছা জন্মিয়াছে। তারই মধ্যদিয়া একটি সরু রাস্তা।

আফ্‌তাব বলিল ঃ আগে সেখানে একটি বাগান ছিল; কিন্তু বাগান মূর্তিমান নিয়ম-শৃঙ্খলা বলিয়া বিদ্রোহীদল সেটা নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

আমি কিছু বলিলাম না। ভাবিলাম বাড়িটা বিদ্রোহীদের আড্ডা হইবার মতো বড়ো গাছ বটে, কিন্তু উহা এত খোলা জায়গায় অবস্থিত যে, পুলিশের পক্ষে বিদ্রোহীদের গতিবিধি লক্ষ্য করা খুবই সহজ।

গেটে প্রবেশ করিয়াই একটা বিষম কোলাহল শুনিতে পাইলাম। সে কোলাহল আড্ডা হইতেই আসিতেছিল বলিয়া বোধ হইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ এ আবার কি আফ্‌তাব?

আফ্‌তাব বলিল ঃ দলের সভ্যরা গান গাইছে।

আমি বিস্ময়ে বলিলাম ঃ গান? এমন তুমুল কোলাহলকে তুমি গান বলছ?

আফ্‌তাব গম্ভীর মুখে বলিল ঃ সংস্কারমুক্ত হতে তোমার ঢের দেরি। গান সম্বন্ধে তুমি আজো মান্ধাতার আমলের ধারণা নিয়ে বসে আছ। জগৎ আজ সভ্যতার পথে দৈনিক কি স্পিডে এগিয়ে যাচ্ছে, তার কিছু খবর রাখ?

আমি মনে মনে স্বীকার করিলাম ঃ আমি সত্যই সংস্কার-মুক্ত নই।

## তিন

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম ঃ সকলেই হা করিয়া চিৎকার করিতেছেন। কেহ হারমনিয়মে, কেহ তবলে, কেহবা তদভাবে পাশে বসা বন্ধুর পিঠে হাত চালাইতেছেন। কেহ কথা বলিতেছেন এবং কেহ গান গাইতেছেন নিশ্চয়ই; কিন্তু কে কোন্‌ কাজ করিতেছেন, সে সম্বন্ধে নির্ভুল উক্তি করিবার কোনও উপায় নাই।

আফ্‌তাবের পিছনে আমাকে দেখিয়া প্রায় সকলেই আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিয়াই অভ্যাসবশত 'আসসালামু আলায়কুম' বলিলাম। অমনি, সকলে সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন ঃ কে এ প্রথার দাস, সংস্কারের গোলাম, আমাদের দলের পবিত্রতা নষ্ট করছে?

আফ্‌তাব আমার কানে-কানে বলিল ঃ ভুল করেছ। এখানে সালাম আদাবের নিয়ম নাই। ওটা একটা প্রথা।

তারপর সে অন্যান্য সকলের ন্যায় চিৎকার করিয়া বলিল ঃ আপনারা অস্থির হবেন না, নতুন লোক। ইনি আমার বন্ধু, আমাদের দলে দীক্ষা নেবার জন্য আজ নতুন এখানে এসেছেন।

সকলে শান্ত হইলেন অর্থাৎ আগের ন্যায় গোলমাল আরম্ভ করিলেন।

আমাকে লইয়া আফ্‌তাব একপাশে বসিয়া পড়িল! আমার সামনে লজ্জাবশতই হোক, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হোক, আফ্‌তাব সদস্যদের 'গানে' যোগ দিল না।

আমিও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল। আমি মনে করিলাম ঃ হাজার হোক বিদ্রোহের পথে ইহাদের তুলনায় আমি নতুন পথিক; কাজেই ইহাদের কার্যের গূঢ় তাৎপর্য বুঝিতে হয়ত আমার একটু দেরি হইতেছে।

নতুন করিয়া ইহাদের প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। মনোযোগ দিয়া ইহাদের কার্যাদি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

এক ভদ্রলোক 'গণ্ডগোল আরম্ভ করুন' 'গণ্ডগোল আরম্ভ করুন' বলিয়া তিন-চার বার চিৎকার করিলে সকলে নীরব হইলেন। আফ্‌তাব আমার কানের কাছে বলিল ঃ সরদার খুব বড় উকিল।

সরদার দাঁড়াইয়া বলিলেন ঃ ব্রাদার-ইন-ল'গণ (বিস্ময়ে আমি আফ্‌তাবের মুখের দিকে চাহিলাম, সে মুখে আঙ্গুল দিয়া আমাকে নীরব থাকিতে ইংগিত করিল) আমাদের আজকার দরবারে 'কনক্লুডি সং' শেষ হয়েছে। এখন চা খেয়ে সবার কাজ আরম্ভ করা যাক্। 'ব্রাদার-ইন-ল' আফ্‌তাবের মুখে তোমরা শুনেছ, আজ এক নতুন ব্রাদার-ইন-ল' আমাদের দলে দীক্ষা নিতে এসেছে; সুতরাং আজকে চা খাওয়ায় তোমরা পুরোপুরিভাবে প্রথা ও সংস্কার মুক্ত হয়ে চলবে, এই আমার কড়া হুকুম।

সকলে সমস্বরে চিৎকার করিলেন ঃ চা।

অমনি জনৈক চাকর চা দিয়া যাইতে লাগিল। কেহ্ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া চা খাইতে লাগিলেন। লক্ষ্য করিলাম ঃ সকলেই পকেট হইতে মুঠ ভরিয়া চিনি মুখে দিয়া তারপর পিয়ালায় চুমুক দিতেছেন, মুখের চিনি ফুরাইয়া গেলে আরেক মুঠা মুখে দিতেছেন। এইভাবে সবাই চা পান করিলেন। আমিও করিলাম।

চা খাওয়ার পর সরদারের হুকুমে আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া হইল। তিনি আমাকে পাশে দাঁড় করাইয়া বলিলেন ঃ ব্রাদার-ইন-ল' আমাদের মতে দীক্ষা নিতে কোন আচার, প্রথা বা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না; কাজেই এখানে বাইয়াৎ পড়া বা মাথা মুড়ানোর দরকার নেই, পাগড়ি বা শালগ্রাম শিলারও আবশ্যকতা নেই। আমাদের আদর্শ কাজে পরিণত করতে যাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন, তাঁরাই আমাদের ব্রাদার-ইন-ল'। তুমি আমাদের দলে ভর্তি হচ্ছ, সুতরাং তোমার সঙ্গে ভদ্রতা করে আমি গতানুগতিকতার প্রশ্রয় দিতে চাই না। আমাদের মটো তোমার মুখস্থ হয়েছে ত?

আমি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম ঃ জি না, আপনার দলের মটো ত আমার জানা নেই।

সরদার প্রবোধ দিয়া বলিলেন ঃ আচ্ছা, আচ্ছা। দু'চার দিন চেষ্টা করলেই মুখস্থ হয়ে যাবে। ওই দেখ।

—বলিয়া তিনি চারিদিককার দেওয়ালে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। আমি দেখিলাম,

দেওয়ালের বিভিন্নস্থানে বড় বড় হরফে লেখা আছে ঃ

মোরা, অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
মোরা দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম-কানুন শৃঙ্খল!
মোরা ভীম ভাসমান মাইন,
মোরা মানিনাকো কোন আইন।
মোরা বিদ্রোহী বীর,
মোরা চির-উন্নত শির।
বল বীর!

আমি চারিদিকে চোখ ফিরাইলাম ঃ সরদার বলিলেন ঃ যত অনিষ্টের মূল এই আইন। যেদিকে কান পাত, যেদিকে চোখ ফেরাও কেবল নিয়ম-কানুন, আইন-শৃঙ্খলা, প্রথা-সংস্কার, ল' এণ্ড অর্ডার। এইসব আইন-শৃঙ্খলার বন্ধনের জন্যই মানুষের আত্মা মুক্তি পাচ্ছে না। এই সমস্ত বিধি-নিষেধের চাপে মানুষের আত্মা নুয়ে পড়ছে। মানুষের কল্যাণ করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আত্মার মুক্তি। আত্মার মুক্তি সাধন করতে হলে সমস্ত আইন-কানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে, সমস্ত বিধি নিষেধের বন্ধন পদাঘাতে ছিন্ন করতে হবে। এই আইন-কানুনের দোহাই দিয়ে, বিধি নিষেধের ছুতা করে, কত লোক অপর সহস্র লোককে দাস করে রেখেছে, তাদের মুক্তির পথ আগ্‌লে বসে আছে। এই আইন-কানুন বিধি-নিষেধের বেড়ি ভাঙাই আমাদের জীবনের ব্রত। এজন্য আমরা প্রাণপাত করতে প্রস্তুত। আমরা নিজেরা কোনও আইন-শৃঙ্খলা বা বিধি-নিষেধ মানি না। সমস্ত গতানুগতিকতা বিসর্জন দিয়ে চলি। ওই যে দেখছ, দেওয়ালের লেখা আছে : Spitting liberally allowed (যত ইচ্ছা থুথু ফেল), Smoking strictly prohibited (ধূমপান একেবারে নিষিদ্ধ)-ওর গূঢ় তাৎপর্য অবশ্য তুমি বুঝছ। এ ঘরের ভেতর থুথু কেউ ফেলবে না বটে, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও বাধ্যবাধকতা থাকলে সদস্যদের মনে বিধি-নিষেধের দাসত্ব বর্ধিত হবে এবং তাতে করে তাদের আত্মার মুক্তি অসম্ভব হয়ে পড়বে। বরঞ্চ এই যে থুথু ফেলবার অবাধ অধিকার দেওয়া সত্ত্বেও এরা কেউ থুথু ফেলছে না, এতে কি তাদের মুক্ত বুদ্ধিই সূচিত হচ্ছে না? আর ঐ স্মোকিং-এর কথা। ওই বড় বড় অক্ষরের নিষেধ বাক্য চোখের সামনে নিয়েও যে সদস্যরা বেদম ধুমপান করছে, এতে করে কি তাদের মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাবই কর্ষিত হচ্ছে না? তুমি লক্ষ্য করেছ, আমাদের দলের সদস্যরা চুপ করতে বললে গণ্ডগোল করে আর গণ্ডগোল করতে বললে চুপ করে। সদস্যদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব কর্ষণ করার জন্যই এরূপ করা হয়ে থাকে। আমি সরদার বলে সদস্যরা যে আমার কথা-মত চলে, তা তুমি মনে করো না। এই যে চা খাওয়ার সময়, বিশেষ করে আজকার দিনটায়, চাতে চিনি খেতে বারণ করেছিলাম, তার উত্তরে সবাই যে আজ বেশি করে চিনি খেল, তাতে আমি বড়ই আনন্দিত হয়েছি। আমরা কেউ ছোট-বড় নই, সবাই আমরা সমান। আমরা জীবনের সর্বত্র ডিমোক্রেসি প্রবর্তনের পক্ষপাতী। তুমি লক্ষ্য করেছ, সংগীতেও আমরা ডিমোক্রেসি প্রবর্তন করেছি। একজন গান করবে আর সবাই শুনবে, এ ছিল গত যুগের মনার্কিক্যাল সিস্টেম-অব-সং। আমরা সমস্ত মনার্কির উচ্ছেদ করতে চাই। সকলের যে গান গাওয়ার অধিকার আছে, মানুষের এই চিরন্তন জন্মগত অধিকার আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু এই ডিমোক্রেসি প্রবর্তন করতে গিয়েও আমরা প্রথা ও গতানুগতিকার কবলে পড়িনি। আমরা পরস্পরকে সমান মনে করি বটে, কিন্তু সম্বোধন করবার বেলা 'ভাই' 'ব্রাদার' বলে

গতানুগতিকার প্রশ্রয় দিই না।

এই পর্যন্ত বলিতেই সভায় শোরগোল উঠিল ঃ সরদার ব্রাদার-ইন-ল'র বক্তৃতা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। বেশি কথা আমরা শুনব না।

সরদার বলিলেন ঃ ব্রাদার-ইন-ল'গণ, তোমাদের বিদ্রোহের ভাবে আমি গর্ববোধ করছি। আমি আমার বক্তৃতা আর দীর্ঘ করব না। এই নতুন ব্রাদার-ইন-ল'কে আমাদের আদর্শ বুঝাতে গিয়েই আমাকে এত কথা বলতে হয়েছে। সবাই একে ব্রাদার-ইন-ল' বল।

সকলে সমস্বরে চিৎকার করিল ঃ ব্রাদার-ইন-ল'।

সরদার আমাকে বলিলেন ঃ ব্রাদার-ইন-ল'।

আমি বলিলাম ঃ ব্রাদার-ইন-ল'।

সরদার বলিলেন ঃ ব্যাস, দীক্ষা কার্যকর হয়ে গেল।

## চার

দীক্ষা পাইয়া আমি বলিলাম ঃ আমার গুটিকতক প্রশ্ন করবার আছে।

সরদার বলিলেন ঃ বল।

আমি বলিলাম ঃ ইংরাজ তাড়াবার আপনারা কদ্দুর কি করেছেন?

সরদার একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন ঃ ইংরাজ তাড়ান মানে কি?

আমি বলিলাম ঃ আপনাদের বিদ্রোহ ইংরাজের বিরুদ্ধে ত?

সরদার সমস্ত সদস্যের দিকে একবার চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন ঃ কেবল ইংরাজ কেন? বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আটকিয়ে যারা মানুষের আত্মাকে খর্ব করছে, তাদের সবারই বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ।

আমি বলিলাম ঃ ইংরাজ জাতি আজ বিধি-নিষেধের নিগড়ে ভারতের ত্রিশ কোটি লোকের হাত-পা বেঁধে রেখেছে। ওদের এদেশ থেকে তাড়াতে পারলে তবেই এই ত্রিশ কোটি লোকের মুক্তি হবে, এটা কি আপনারা মনে করছেন না?

সরদার বলিলেন ঃ নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু ইংরাজ আমাদের হাত-পাই বেঁধে রেখেছে, আত্মাতো বাঁধে নি। আমাদের স্থুল দেহই ইংরাজের অধীন, আমাদের সূক্ষ্ম দেহের উপর তাদের কোন হাত নেই। যত সব বিধি-নিষেধই আমাদের সূক্ষ্ম দেহকে বন্ধনের অধীন করে রেখেছে। সে জন্য ইংরাজের চেয়ে আমাদের বড় শত্রু এই সমস্ত কুসংস্কারপূর্ণ বিধি-নিষেধ। এ সমস্ত নিগড় না ভাঙলে সভ্যতার পথে আমাদের পথ চলা অব্যাহত হবে না। বিধি-নিষেধের বন্ধনের চাইতে তুমি যে ইংরাজের বাঁধনকেই বড় করে দেখেছ, এতে করে তুমি মানুষের দেহকে আত্মার উপর স্থান দিচ্ছ।

আমি উষ্ণ হইয়া বলিলাম ঃ জালিয়ানওয়ালাবাগ, চরমনাইর, কুলকাঠি প্রভৃতি স্থানে যেভাবে মানুষকে কীট-পতঙ্গের মতো পিষে মারা হয়েছে, দেশবাসীর সাধারণ নাগরিকের অধিকার যেভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে, এ সকলকে কি আপনারা আমাদের আত্ম-বিকাশের পরিপন্থী মনে করেন না?

সরদার কোন কথা বলিবার আগেই সকলে চিৎকার করিয়া উঠিলেন ঃ এ সবই চিন্তার দৈন্য; বুদ্ধির দাসত্ব। নতুন ব্রাদার-ইন-ল' আজও সংস্কারমুক্ত হতে পারেনি।

সরদার বলিলেন ঃ শুনলে ত? তুমি আজো সংস্কারমুক্ত হতে পারনি। এ-সব তোমার জাতি-বিদ্বেষ-রেশিয়াল হ্যাট্রেড, ১৫৩-ক ধারার অপরাধ। সমস্ত বিষয় বিশ্ব-মানবতার

দৃষ্টিকোণ থেকে দেখো। ইংরাজের অত্যাচারে এবং ভারতবাসীর অত্যাচারে মূলত কোন পার্থক্য নেই। এই সমস্ত তুচ্ছ অজুহাতে যারা জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে, তারা সংকীর্ণ সংস্কারের দাস, বিশ্ব-মানবতার শত্রু।

আমি মনে মনে এই সমস্ত যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া বলিলাম ঃ আমি শুধু অত্যাচারের কথাই বলছি না। ইংরাজদের আমাদের দেশ শাসন করার কি অধিকার আছে?

সরদার হাসিয়া বলিলেন ঃ এ সমস্তই পূর্ব-সংস্কার। 'ইংরাজ জাতি' 'ভারতবাসী' এ সবই বিশ্ব-মানবতার পরিপন্থী গণ্ডি-সংস্কার। বিশ্ব-মানবতা যাদের আদর্শ তাদের মধ্যে ইংরাজ-বাঙালি-তুর্কীতে কোন ভেদজ্ঞান নাই। আর দেশ শাসনের কথা যে বলছ, দেশ শাসন কি আর সবাই করে। কতিপয় নির্দিষ্ট লোকই দেশের শাসনযন্ত্র পরিচালনা করে। এই নির্দিষ্ট কতিপয় কোন জাতের লোক তা যারা দেখে, তাদের দৃষ্টি সম্প্রসারিত হয়নি, তারা গতানুগতিকতার প্রভাব এড়াতে পারেনি, তারা প্রথাও সংস্কারমুক্ত হতে পারেনি। আশা করি আমাদের দলের শিক্ষায় তোমার দৃষ্টি উন্নত হবে। আজকার সভার কাজ এখানে শেষ করা যাক। ব্রাদার-ইন-ল'গণ তোমরা এবার 'ওপেনিং সংটা' গাও ত।

সকলে ডেমোক্রেটিক্ সংগীত আরম্ভ করিলেন।

আমরা বধির হইবার উপক্রম হইলেও কোন রকমে চোখ কান বুজিয়া বসিয়া রহিলাম।

## পাঁচ

বিদ্রোহীদলের কাজ-কর্ম দেখিয়া আমি একরূপ নিরাশই হইয়া গিয়াছিলাম।

তবু কিন্তু দুইটি কারণে আমি ঢাকায় থাকিয়া গেলাম এবং বিদ্রোহীদলের বৈঠকে যোগদান করিতে লাগিলাম। প্রথম কারণ, আমার উত্তেজনা অনেকখানি কমিয়া যাওয়ায় এখন কি করা যায়, সে সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা; দ্বিতীয় কারণ, বিদ্রোহীদল হয়ত নতুন বলিয়া আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেছে না, এই সন্দেহে।

কিন্তু সপ্তাহকাল থাকিয়াও বিদ্রোহীদলের অস্ত্রের আড্ডার কোন সন্ধান পাইলাম না বিদ্রোহীদলের উপর রাগ হওয়া সত্ত্বেও কার্যান্তর না থাকায় উহাদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদও করিলাম না।

একদিন রমনার মাঠে লেকের ধারে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছি, এমন সময় আমার কলিকাতার গড়ের মাঠে বন্ধু আসিয়া হাজির। আমি বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম ঃ কি ব্রাদার-ইন-ল' আপনি এখানে? কোলকাতা থেকে কবে এসেছেন? দলে ত আপনাকে দেখতে পাওয়া যায় না।

বন্ধু হাসিয়া বলিলেন ঃ বেশ ত এরই মধ্যে দলের সম্বোধনটা আয়ত্ত করে ফেলেছেন। তা, আছেন কেমন? দল লাগছে কেমন? এই বলিয়া তিনি আবার হাসিলেন।

আমি রাগতস্বরে বলিলাম ঃ খুব বিদ্রোহীদলে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। বলুন ত সাব, আপনার মতলবখানা কি? রাগ করবেন না, আপনাকে আমার সত্যি সত্যি ব্রাদার-ইন-ল' ডাকতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ভদ্রলোক উচ্চস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

আমি বিরক্তিভরে লোকটার হাসি থামিবার অপেক্ষায় অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলাম। অবশেষে হাসি থামাইয়া তিনি বলিলেন ঃ আপনার যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মেছে। আপনি আমার কেবল ব্রাদার-ইন-ল' নন, আপনি আমার ধর্মের ভাই। আপনার নিকট আসল কথা আর গোপন রাখব না। আমি পুলিশের

সি-আই-ডি বিভাগের লোক। এই বেটাদের মুখে দিনরাত বিদ্রোহের বুলি শুনে শুনে আমাদেরও প্রথমটা মনে হয়েছিল, চাই কি এরা ইংরাজের সাম্রাজ্যই চুরমার করে দেয়। তাই বড় মুখে বড় সাহেবের কাছে এদের সম্বন্ধে এত্তেলা নিয়েছিলাম এবং একটা বড় রকমের খানাতল্লাশেরও যোগাড় করে ফেলেছিলাম। আশা করেছিলাম, এতবড় একটা কেসের আশকারা করছি বলে ডবল প্রমোশনও একটা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সন্ধান নিয়ে দেখি কি, ওদের একটা বেটার মধ্যে রিভোলিউশনারি স্পিরিট নেই—সব বেটাই গর্দভ। বন্ধুরা বললে ঃ ঐ গর্দভদের ধরিয়ে দিলে বড় সাহেব রাগ করবেন, চাই কি আমার চাকুরিও যেতে পারে! তাই দু'চার জন সত্যিকার রিভোলিউশনারিকে ঐ দলে ঢুকবার জন্য কিছুদিন আমাকে ঢাকা-কোলকাতা ছুটাছুটি করতে হয়েছে। এখন খোদার ফজলে আমি বেঁচে গিয়েছি। বড় সাহেব ইনকোয়ারির আদেশ না দিয়েই রিটায়ার করে গেছেন। আপনাকে বৃথা তক্‌লিফ দিলাম। মাফ করবেন। আসসালামু আলায়কুম।

—বলিয়া ভদ্রলোক হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি ক্রোধে ফুলিয়া উঠিয়াছিলাম! লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলাম ঃ বেটা ব্রাদার-ইন-ল'।

বাসায় ফিরিয়া আফ্‌তাবকে সব খুলিয়া বলিলাম। সে সি-আই-ডির উদ্দেশ্যে কটুক্তি করিয়াই চুপ করিয়া গেল।

আফ্‌তাব কথাটা কিভাবে দলে রিপোর্ট করিয়াছিল জানি না। দেখলাম ঃ দলের সবাই আমাকে এড়াইয়া চলিতে চাহিতেছেন।

সরদার আমাকে বলিলেন ঃ তোমাকে আমরা প্রথমেই জানিয়েছি, বিশ্ব-মানবতাই আমাদের আদর্শ। এতদিনেও যদি তোমার মন থেকে সংকীর্ণ জাতি-বিদ্বেষ দূর হয়ে না থাকে, তবে তোমার আর আশা নেই।

আরেকদিন আড্ডার দ্বারে পা দিয়াই শুনিতে পাইলাম, সরদার বলিতেছেন ঃ লোকটাকে আজই বিদেয় করে দাও। আর ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সাহেবের কাছে এখনই এই মর্মে দু'খানা পত্র লিখে দাও যে, বিশ্বমানবতাই আমাদের আদর্শ, সোশিয়্যাল রিফর্মই আমাদের কর্মপদ্ধতি, আর রাজ-ভক্তি প্রচারই আমাদের জীবনের ব্রত, বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য আমরা প্রাণ দিতে পারি। আর শোন, লিখে দাও যে আমাদের সভাপতির মামাত ভাই গত মহাযুদ্ধে সাম্রাজ্যের জন্য প্রাণ দিয়েছেন!

আমি একটু দেরি করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম।

সরদারই প্রথম কথা বলিলেন ঃ তোমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে গতানুগতিকতার প্রশ্রয় দিতে চাই নে। নইলে তোমাকে 'আপনি' এবং 'জনাব' বলে জানিয়ে দিতুম—'আপনার সঙ্গে আমাদের আর সম্বন্ধ নেই। আশা করি, এতেই তুমি বুঝতে পাচ্ছ, কাল থেকে আর তোমার এখানে আসার দরকার নেই! এখনই তোমাকে বিদেয় করলে রাগ প্রকাশ করা হবে। রাগ একটা প্রথা, একটা গতানুগতিকতা। আমরা যে তোমার উপর রাগ করিনি, এখনি তার প্রমাণ দিচ্ছি। ওরে কে আছিস, এক কাপ চা নিয়ে আয় ত।

এত ক্রোধেও আমার হাসি পাইল। আমি হাসিয়া বলিলাম ঃ চা যে দিবেন আমি আজ ত চিনি আনিনি।

সরদার বলিলেন ঃ আত্মার দৈন্য! বেচারা সংস্কার-মুক্ত হতে পারেনি। ওহে তোমরা কেউ যদি চিনি এনে থাক, চুপে-চুপে ওকে খানিকটা দিয়ে দাও ত।

আমি হাসিয়া বলিলাম ঃ না ব্রাদার-ইন-ল', আমার চা'র দরকার নেই আমি আসি।

কিন্তু উঠিলাম না! পুলিশ সাহেব ও ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লিখিত পত্রদ্বয়ের অবস্থা জানিবার জন্য বসিয়া রহিলাম।

আমার সারিবার কোন গতিক না দেখিয়া সরদার হুকুম করিলেন ঃ আমার সেই জরুরী পত্র দু'খানা কি ডাকে দেওয়া হয়েছে? না হয়ে থাকলে জলদি পাঠিয়ে দাও।

বলিয়া তিনি জনৈক সদস্যের দিকে ইংগিত করিলেন।

খানিক পরেই চাকর পত্র দু'খানা লইয়া সাইকেলে বাহির হইয়া গেল।

সুতরাং আমিও উঠিবার আয়োজন করিলাম।

এমন সময় হঠাৎ পত্র-বাহক চাকরটা ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিল ঃ এই দিকে একপাল পুলিশ আসছে দেখে এলুম।

সবাই একসঙ্গে চিৎকার করিয়া উঠিলেন ঃ তবেই হয়েছে, শালার পুলিশ আসছে আমাদের গ্রেফতার করতে!



অভিনব ধরনে...প্রাচীর টপকাইয়া সটকিয়া পড়িলেন

—বলিয়া সবাই ছুটাছুটি করিয়া পালাইতে লাগিলেন।

সরদার চিৎকার করিয়া বলিলেন ঃ ব্রাদার-ইন-ল' তোমরা গতানুগতিক উপায়ে পালিও না; আত্মরক্ষার চিরন্তন সত্যকে স্বীকার করতে গিয়ে তোমরা অপবিত্র প্রথার প্রশ্রয় নিয়ে আমাদের সংঘের উদ্দেশ্যের অপমান করো না।

—বলিয়া তিনি সম্পূর্ণ অভিনব ধরনের পদক্ষেপ করিয়া নিতান্ত অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সর্বাগ্রে প্রাচীর টপকাইয়া সটকিয়া পড়িলেন। সকলে তাহাকে অনুসরণ করিলেন।

আমি বিদ্রোহী বীরদের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া বহুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। তারপর যখন বাহিরে আসিলাম, তখন রমনার ময়দান নির্জনতায় খা খা করিতেছে!

# ধর্ম রাজ্য

..........র সম্পাদক সাহেব ধরিলেন ঃ তাহার কাগজের জন্য একটা গল্প চাই।

বিষম ভাবনায় পড়িলাম। দ্বিজেন্দ্রলালের বীরবর 'হাতে পার্তামের' মত চেষ্টা করিলে আমিও যে একজন গল্প-লেখক হইতে পারিতাম তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু হইতে যে পারি নাই তাতেও সন্দেহ নাই। অথচ গল্প একটা দিতেই হইবে।

তাই এই ভাবনা।

সেদিন অফিস হইতে সকাল-সকাল বাসায় ফিরিয়া টেবিলের সামনে দোয়াত-কলম লইয়া বসিলাম। অনেক ভাবিলাম, কাগজে অনেক আঁচড় কাটিলাম, বন্ধু-বান্ধব স্ত্রী-শালী যাহার কথা মনে আসিল তাহারই নাম লিখিলাম। মানুষের মাথা আঁকিলাম্ পাখির ঠ্যাং আঁকিলাম কিন্তু গল্পের কোনও কিনারাই করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

মনে করিলাম ঃ একটু তামাক না খাইলে মাথা পরিষ্কার হইবে না। নিজ হাতে তামাক সাজিলাম, একা-একা অনেকক্ষণ তামাক টানিলাম; অনেক কালের অনেক কথা মনেও পড়িল, কিন্তু গল্পের প্লট একটাও আসিল না।

তামাক পুড়িয়া গেল। হুঁক্কাটা সরাইয়া রাখিয়া আবার ভাবিতে বসিলাম।

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মনে পড়িল ঃ বসিয়া লিখিতে গেলে আমার কলমে লেখা আসে না; বুকের নিচে বালিশ দিয়া উপুড় হইয়া লেখা শুরু করিলে আমার ভাবের অভাব হয় না।

এতক্ষণ এই কথাটা মনে না হওয়ায় নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে শয্যা গ্রহণ করিলাম।

প্রথমতঃ পা গুটাইয়া বুকের নিচে বালিশ দিয়া লেখার ভংগিতেই বসিলাম। কিন্তু অতি অল্পক্ষণেই পা দুইটা সটান লম্বা হইয়া গেল। বালিশটাও দুষ্টামি করিয়া আস্তে-আস্তে বুকের নিচ হইতে ক্রমে মাথার দিকে আসিতে লাগিল। আমার তাতে আপত্তি ছিল না মোটেই।

আমি বালিশের উপর মাথা রাখিয়া গল্পের প্লট আবিষ্কারের গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলাম।

## দুই

হঠাৎ বাহিরে কোলাহল শুনিলাম।

দৌড়িয়া আসিলাম।

দেখিলাম ঃ বিরাট ব্যাপার! কাতারে-কাতারে হাজার-হাজার মুসলমান ইট পাটকেল ছুরি লাঠি গাছের ডাল ইত্যাদি হাতে করিয়া দ্রুতগতিতে শহরের পশ্চিম অংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না শহরের মধ্যে এত বড় একটা ব্যাপার ঘটিয়াছে, অথচ আমি তার কিছুই জানি না।

অবশেষে সাহস করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প-দ্রুতগামী একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ ব্যাপার কি সাহেব, আপনারা এত লোক কোথায় যাইতেছেন?

লোকটি আমার দিকে চোখ রাংগাইয়া বলিলেন ঃ তুমি কোথাকার লোক বটে হে? ইসলাম আজ বিপন্ন, তুমি তার কোনো খবর রাখ না?

—বলিয়াই তিনি আবার ছুট দিলেন।

আমি একটা খবরের কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করি; অথচ কলিকাতায় ইসলাম বিপন্ন হওয়ার মতো এত বড় একটা খবর জানি না!

নিতান্ত শরমিন্দা হইলাম।

তাই দ্রুতগতিশীল লোকটির পিছনে দৌড়াইতে-দৌড়াইতে মিনতি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ আমি একটা খবরের কাগজের সম্পাদক; সব কথা আমাকে খুলিয়া বলুন, আমি কাগজে ভীষণ আন্দোলন শুরু করিব।

লোকটি গতি একেবারে থামাইয়া ফেলিলেন। আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন ঃ কাগজের সম্পাদক? হিন্দু কাগজ নয়ত?

আমি আমার দাড়িতে হাত দিয়া বলিলাম ঃ আমি নিজে খাঁটি মুসলমান, এবং এক মুসলমান কাগজে সম্পাদকতা করি।

লোকটি মুখ ভেংচাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ স্বরাজ্য দলের টাকা খাও?

আমি খুব জোরের সঙ্গে বলিলাম ঃ এক কানাকড়িও না।

ভদ্রলোক খুশী হইলেন।

বলিলেন ঃ হিন্দুরা মসজিদের সামনে দিয়া বাদ্য বাজাইয়া মিছিল বাহির করিবে। আমরা বাধা দিব। সে বাধা ঠেলিয়া হিন্দুরা দলে বলে লাঠি সোটা লইয়া অগ্রসর হইবে। তাই আমরা ইসলামের ইয্যতের জন্য জান নেসার করিতে ছুটিয়াছি। তোমার যদি মুরাদ থাকে, তবে ধর্মের জন্য প্রাণ দিয়া শহীদ হইবার এই সুযোগ ছাড়িও না।

—বলিয়াই লোকটি হাতের লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে অগ্রগামী জনতার সঙ্গে মিশিবার জন্য ছুটিতে লাগিলেন।

আমি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিলাম।

মনে হইল ঃ ইসলামের ইয়যৎই যদি নষ্ট হয়, তবে আমাদের বাঁচিয়া লাভ কি? দুষ্ট হিন্দুরা পবিত্র মসজিদের সামনে দিয়া বাদ্য বাজাইয়া যাইবে, ইহাও কি আমাদিগকে চোখ মেলিয়া বরদাশ্‌ত্‌ করিতে হইবে? না, ইহা হইতেই পারে না।

আমি রাস্তা হইতে একটা লাক্‌ড়ি কুড়াইয়া লইয়া জনতার সহিত মিশিবার আশায় প্রাণপণ ছুটিলাম।

আমি যখন জনতার সঙ্গে আসিয়া মিশিলাম, তখন জনতা একটা বড় মসজিদের সামনে কাতার করিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দৌড়াইয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম। এইবার খানিকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া চারিদিকে চাহিবার সুযোগ পাইলাম।

দেখিলাম ঃ বিরাট ব্যাপার।

শহরের চারিদিক হইতে দলে-দলে মুসলমান আসিয়া সেখানে বিরাট জনতার সৃষ্টি করিয়াছে। রাস্তায় একটি সুই ফেলিবার জায়গা নাই। সবারই মুখ ধর্মের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান।

কলিকাতার মুসলমানদের মধ্যে এরূপ ধর্ম-জ্ঞান দেখিয়া আমার মৃত প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। তবে ত মুসলমান আজো মরে নাই। সত্যই ত এরা আজো একটা জীবন্ত জাতি।

প্রাণে বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো একটা পুলকের ঢেউ আসিয়া লাগিল।

আপন মনে ইসলামের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়া তাহাই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

হঠাৎ বিপুল 'কালী মাইকি জয়'-ধ্বনিতে আমার চমক ভাংগিয়া গেল।

সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম ঃ ব্যাপার আরও বিস্ময়কর! হাজার হাজার হিন্দু কাতার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গুজরাটী, মদ্রাজী, কাশ্মিরী, মাড়োয়ারী, বিহারী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, শুদ্র প্রভৃতি নানা জাতের নানা বর্ণের হিন্দু গায়ে-গায়ে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়া হিন্দু জাতির ঐক্য ঘোষণা করিতেছে। তাহারা নিশ্চয় হিন্দু ধর্মের ইজ্জত রক্ষায় প্রাণদানের জন্যই অপেক্ষা করিতেছে। হিন্দু জনতার মধ্যে ঐ যে শিখ পার্শী বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতির দু'চার জন দেখা যাইতেছে! তবে কি তাহারাও নিজেদের 'হিন্দু'ত্বে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে? তাহারাও কি তবে মসজিদের সামনে বাদ্য বাজাইয়া হিন্দুর নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে?

আমার পুলকানন্দ দ্বিগুণ হইয়া গেল। স্বধর্মে শিথিল ও আস্থাহীন বলিয়া আমি এতদিন হিন্দুদের নিন্দা করিতাম। বিভিন্ন বর্ণের হিন্দুর মধ্যেকার তীব্র অনৈক্যের জন্য আমি হিন্দু বন্ধুদের অনেক সময় তিরস্কারও করিয়াছি। সেই বিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে, ধর্ম ত বড় কথা, বাদ্যের জন্য এমন করিয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত দেখিয়া আমি হিন্দুদের সম্বন্ধে আমার পূর্বের ধারণা বদলাইলাম।

এমন সময় 'হিন্দু ধর্ম কি জয়' ধ্বনি গগন বিদীর্ণ করিল। আমার সামান্য সন্দেহটুকুও দূর হইয়া গেল।

মুসলমান জনতা এর জবাব দিল। তাহাদের 'আল্লাহু-আকবর' ধ্বনি আসমান ফাটাইল।

আমি বুঝিলাম ঃ ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যখন এমন ধর্মভাব জাগরুক হইয়াছে, তখন স্বরাজ না হইবার আর কোন কারণ থাকিল না। কংগ্রেস-খেলাফত নেতারা এতদিন এই বস্তুটির অভাবের জন্য আফসোস করিতেছিলেন।

গান্ধী টুপি-পরা মালকাছা-মারা কয়েকজন কংগ্রেস নেতা মিলিটারী ভংগিতে হিন্দু জনতা তদারক করিয়া বেড়াইতেছিলেন।

সব ঠিক আছে দেখিয়া তাহারা জনতাকে মার্চিং অর্ডার দিলেন।

হিন্দু মিছিল অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিল।

চান-তারা মার্কা মোহাম্মদ আলী ক্যাপ-পরা খেলাফতী নেতারা মুসলিম জনতার নেতৃত্ব করিতেছিলেন।

তাঁহারা বিউগল বাজাইলেন।

মুসলমান জনতা মুযবুত হইয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল।

ইট-পাটকেল ছুড়াছুড়ি চলিল।

ক্রমে দুইপক্ষের জনতার দূরত্ব কমিতে লাগিল।

অবশেষে ছুরি খেলায় হাত সাফাইর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল।

তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল।

সমবেত পুলিশ ফুটপাতে কাতার করিয়া উপরওয়ালার হুকুমের অপেক্ষা করিতে লাগিল। গোরা সার্জেন্টরা ঘোড়ায় চড়িয়া ধর্ম-যুদ্ধে রত ভারতবাসীর স্বর্গগমনের ধারা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

যুদ্ধ ঘন্টাখানেক চলিল।

উভয় পক্ষে শত শত লোক হতাহত হইল। সুতরাং যুদ্ধ থামিল।

পুলিশের কর্তব্য করিবার সময় হইল; উপরওয়ালার হুকুম আসিল। তাহারা উভয় পক্ষের হাজার কয়েক লোক গ্রেফ্‌তার করিল।

একজন দর্শক গোছের ভদ্রলোক পুলিশের বড় সাহেবের কাছাকাছি গিয়া বলিলেন ঃ যতক্ষণ দাংগা-হাংগামা হইতেছিল, ততক্ষণ আপনারা পাশে দাঁড়াইয়া বেশ তামাশা দেখিতেছিলেন; এখন সেই দাংগা থামিয়া গিয়াছে, এতক্ষণে আসিয়াছেন আপনারা গ্রেফ্‌তার করিতে। এই বুঝি পুলিশের শান্তিরক্ষা?

পুলিশের বড়কর্তা একজন ইংরাজ।

তিনি বক্তার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া একটা শিস দিয়া বলিলেন ঃ আমরা কি করিতে পারি? হিন্দু-মুসলমান উভয় পক্ষ বলিতেছে এটা তাহাদের ধর্মযুদ্ধ। ভারতবাসীর ধর্ম-কার্যে বাধা দেই বলিয়া আমরা ইংরাজ জাতির ইতিমধ্যেই অনেক বদনাম হইয়া গিয়াছে। আমাদের সে বদনামের পাল্লা আর ভারি করিতে চাই না।

পুলিশ সাহেবের সহকারীরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ভদ্রলোক আস্তে আস্তে সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

গ্রেফ্‌তার চলিতে লাগিল।

ধর্ম-যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া শহরময় ছড়াইয়া পড়িল। কারণ যেসব মহল্লায় ইতিমধ্যেও যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হইল না, সে সব স্থানেও তদন্ত ও গ্রেফ্‌তার করিয়া পুলিশ তথায়ও যুদ্ধ-মনোভাব ছড়াইয়া দিল। ফলে হিন্দুপল্লীতে হিন্দুরা মুসলমানের উপর এবং মুসলমান-পল্লীতে মুসলমানেরা হিন্দুর উপর মারপিট ও লুটপাট চালাইতে লাগিল।

হিন্দু-পল্লীর মুসলমানেরা এবং মুসলমান-পল্লীর হিন্দুরা পালাইতে লাগিল।

যাহারা পালাইতে পারিল না, তাহারা শহীদ হইতে লাগিল।

## তিন

অবশেষে হাতের লড়াই থামিল।

কিন্তু দাঁতের লড়াই থামিল না। বাঁশের লড়াইর বদলে বাঁশীর লড়াই চলিতে লাগিল। হিন্দু কাগজওয়ালারা মুসলমানদিগকে এবং মুসলমান কাগজওয়ালারা হিন্দুদিগকে প্রাণ ভরিয়া গালি দিতে লাগিল।

নেতারা নিজেদের দলের মধ্যে সভা করিয়া বিপক্ষের বিরুদ্ধে দেহ ভরিয়া নর্তন ও গলা ভরিয়া গর্জন করতে লাগিলেন। সত্যসনাতন ধর্ম অধিকতর বিপন্ন হইয়াছে বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের ও সম্পাদকদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল।

ইংরাজ সরকারের নিকট বিচার চাওয়া হইল ঃ মসজিদের সামনে বাদ্য বাজনা চলিবে কি না?

সরকার তাঁহার নিরপেক্ষ নীতি অনুসারে ফরমান জারি করিলেন ঃ এ বিষয়ে চির-প্রচলিত প্রথা অনুসারে কাজ হইবে। সুতরাং প্রথা কি [illegible] সরকারকে জানাও [illegible]

মুসলমান নেতারা সকলে এক বাক্যে জানাইলেন ঃ তাঁহারা সারা বাংলাদেশ তন্ন-তন্ন করিয়া তালাশ করিয়া দেখিয়াছেন, হিন্দুরা চিরকাল সর্বত্রই সকল মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধ করিয়া আসিয়াছে।

হিন্দু নেতারা সর্বসম্মতিক্রমে জানাইলেন ঃ সূর্য একদিন পশ্চিম দিকে উদিত হইয়া থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দুরা কুত্রাপি কস্মিন কালেও মসজিদের সামনে বাদ্য বন্ধ করে নাই।

বেচারা ইংরাজ সরকার বিদেশী মানুষ। এদেশের প্রাচীন প্রথার কথা তাঁহাদের জানা নাই। তবে দুই পক্ষের কথাই যে সত্য হইতে পারে না, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন।

তাই তাঁহারা বিষম ভাবনায় পড়িলেন।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সরকার উভয় পক্ষের প্রতি সমান হাতে ইনসাফ করিবার উদ্দেশ্যে আবার হুকুম জারি করিলেন ঃ যেসব জায়গায় মসজিদের সংখ্যা খুব বেশি, সেইসব অঞ্চল মুসলমান-মহল্লা বলিয়া ঘোষিত হইবে। তথায় দুই-একটা মন্দির থাকিলেও সে অঞ্চলে মসজিদের সামনে বাদ্য বাজান চলিবে না। পক্ষান্তরে, যে-সব অঞ্চলে মন্দিরের সংখ্যা খুব বেশি, সেইসব অঞ্চল হিন্দু-পল্লী বলিয়া ঘোষিত হইবে; সেখানকার মসজিদের সামনে হিন্দুরা যত ইচ্ছা বাজনা বাজাইতে পারিবে। আর, যে-সময়টাতে মুসলমানরা নামাজ পড়িবে না, সেই সময়ে হিন্দুরা মুসলমান মহল্লার মন্দিরে গিয়া পূজা দিয়া আসিবে, এবং যে সময়টা হিন্দুদের পূজার সময় নয়, সেই সময়ে মুসলমানরা হিন্দু পল্লীস্থ মসজিদসমূহে গিয়া আজান দিয়া আসিবে।

এই সরকারি আদেশ প্রকাশ্য সভায় এবং মুদ্রিত ইশতাহারে ঘোষিত হইল।

হিন্দু-মুসলমান উভয় দল এই আদেশ শুনিয়া ঠোঁট কামরাইতে-কামড়াইতে বাড়ি ফিরিল।

সারা রাত পরামর্শ হইল, হৈ চৈ হইল, গোলমাল হইল, ঠুকঠাক ও ধুপধাপ শব্দ হইল, 'আল্লাহু-আকবর' ও কালী মায়কি জয়' ধ্বনি হইল।

গোলমালে সাহেবদের ঘুম টুটিয়া গেল বটে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান কোনো ধর্ম কার্য করিতেছে মনে করিয়া আবার তাহারা পাশ ফিরিয়া শুইল।

শেষ রাতে শঙ্খ-কাঁসরের অসহ্য আওয়াজে ভীষণ গোলমালে সাহেবদের ঘুম ছুটিয়া গেল।

তাহারা উঠিয়া দেখিল ঃ আজব কাণ্ড! কলিকাতার সেই বিরাট চৌতালা পাঁচতালা বাড়ির একটাও আর বাড়ি নাই,-সবগুলিই মন্দির ও মসজিদ হইয়া গিয়াছে। বাড়ি-ঘর স্কুল-কলেজ মকতব-মাদ্রাসা-অফিস-আদালত দোকান-পাট কিছুরই আর অস্তিত্ব নাই-সব মন্দির আর মসজিদ, মসজিদ আর মন্দির! আর হিন্দু-মুসলমান ছাত্র-শিক্ষক কেরানী চাপরাশি দোকানদার খরিদ্দার ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ সবাই যাহার তাহার কাজ ছাড়িয়া সেইসব মন্দির ও মসজিদে নন্‌স্টপ্‌ পূজা করিতেছে এবং নামাজ পড়িতেছে।

লাট সাহেব আসিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন।

হিন্দুরা কি বলিল কাসরের আওয়াজে তাহা বুঝা গেল না। মুসলমানরা বলিল ঃ মসজিদে চব্বিশ ঘন্টাই নামাজ পড়া ফরজ। লাট সাহেব আবার ভাবনায় পড়িলেন।

[illegible] নিজে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া বড়লাট সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিবার [illegible]সহ শিমলা চলিয়া গেলেন।

এদিকে হিন্দুরা অষ্টপ্রহর শঙ্খ-ঘন্টা-কাঁসর বাজাইয়া পূজা অর্চনা করিতে থাকিল!

মুসলমানরা চব্বিশ ঘন্টা আজান দিয়া নামাজ পড়িতে থাকিল।

সমস্ত বাড়ি-ঘর মন্দির ও মসজিদ হইয়া পড়াতেও লোকজনের রাত্রি বাসের কোনই অসুবিধা হইল না; কারণ চব্বিশ ঘন্টাই যাহারা পূজা অর্চনা ও এবাদত-বন্দেগিতে ব্যস্ত, তাহাদের আবার রাতদিন অথবা অন্দর বাহির কি?

সমস্ত হিন্দু পূজা-অর্চনায় এবং সমস্ত মুসলমান নামাজ-বন্দেগিতে চব্বিশ ঘন্টা ব্যস্ত থাকায় কলিকাতার কাজকর্ম থামিয়া গেল। ব্যবসায়-বাণিজ্য-দোকানপাট হোটেল-রেস্তোরা গাড়ি-ঘোড়া ট্রাম-ট্যাক্সি সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল।

সাহেবরা অন্তত নিজেদের অসুবিধা দূর করিবার জন্য গাড়ি-ঘোড়া চালাইবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু পূজা ও নামাজ ছাড়িয়া কোন হিন্দু বা মুসলমান কাজ করিতে রাজি হইল না।

লোকাভাবে সাহেবদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

কিছুদিন গেল এইভাবে। যাইতও আরো কিছুকাল—

কিন্তু লোকজনের ক্ষুধা লাগিল। অথচ ধর্মকাজ ফেলিয়া পেটের আয়োজন করিতে কেহই প্রস্তুত ছিল না।

কিন্তু ক্ষুধা বাড়িয়া চলিল। সকলের নাড়ি-ভুঁড়ি চু-চু করিতে লাগিল।

উভয় পক্ষেই দুই একজন অপেক্ষাকৃত কম ধার্মিক লোক ছিল। তাহারা প্রস্তাব করিলঃ কিছুক্ষণের জন্য উপাসনা মুলতবি রাখিয়া পেট ভরিয়া খাইয়া লওয়া যাক্।

খাইয়া যে লওয়া উচিত, তা সকলেই স্বীকার করিল। কিন্তু খাইবে কি? খাবার কোথায়? চাউল-ডালও ত নাই। রাঁধিবে বা কে? কোথায় বা রাঁধিবে? মন্দির-মসজিদে ত আর রান্না চলে না?

বিবেচনা করিয়া দেখা গেল ঃ খাইতে গেলে আবার দোকানপাট খুলিতে হয়, মন্দির-মসজিদকে আবার রান্নাঘর বানাইতে হয়! কিছুক্ষণের জন্যও কোন উপাসনা বন্ধ করিলেই যে অপরপক্ষে তাহাদের মহল্লায় প্রবেশ করিয়া উপাসনা করিয়া যাইবে। খ্রিস্টান লাট সাহেবের যে হুকুম তাই!

কাজেই আহার করা আর হইল না।

নামাজ ও পূজা চলিতেই থাকিল।

ক্ষুধার জ্বালায় ক্রমে সকলে অচেতন হইয়া পড়িল।

## চার

আমি ছিলাম বরাবরের অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্যের রোগী। কাজেই ক্ষুধা আমাকে তেমন কাবু করিতে পারিল না।

তথাপি অনেক দিনের অনাহারে নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়িলাম; মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম! খুবই ঘুম পাইতে লাগিল। কিন্তু ঘুমাইয়া পড়িলে হিন্দুরা পাছে আবার বাদ্য বাজাইয়া যায় এই ভয়ে ঘুমাইলাম না, তাই বসিয়া-বসিয়া ঝিমাইতে লাগিলাম।

অবশেষে নিজের অজ্ঞাতেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ কাহার ধাক্কায় ঘুম ভাংগিয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখিলাম ঃ লাট সাহেব।

আমি তাহাকে ভক্তিভরে কুর্ণিশ করিতে গেলাম।

বাধা দিয়া তিনি নিঃশব্দে আমার হাত ধরিলেন এবং টানিয়া মসজিদের বাহিরে রাস্তায় আনিয়া আমাকে দাঁড় করাইলেন। তারপর হাতের ইশারায় চারদিক দেখাইলেন।

A180284



আমি ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া চাহিয়া ভয়ে বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিলাম! দেখিলাম ঃ সারি-সারি মৃতদেহ স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। চিনিলাম ঃ ইহারা সবাই আমার সহকর্মী উপাসনা-রত হিন্দু-মুসলমান। তাহাদের পচা দেহ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে বটে, কিন্তু মুখ তাহাদের ধর্মের জ্যোতিতে উজ্জ্বল। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করিলাম ঃ হিন্দু মৃতদেহগুলির বুকের উপর এক-এক খণ্ড গৈরিক বস্ত্রে আবিরের অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—'আর্য বীর' এবং মুসলমানদের বুকের উপর সবুজ-সবুজ বস্ত্রখণ্ডে রূপালী হরফে লেখা রহিয়াছে—'শহীদ'।

পুলকের আতিশয্যে আমার কান ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল। আমি সগর্বে লাট সাহেবের দিকে চাহিলাম।

বুকে একটি ক্রসচিহ্ন আঁকিয়া লাট সাহেব বলিলেন ঃ বাঙালি জাতটা আজ ধর্মের জন্যেই প্রাণ দিল। ধন্য এই জাতি। আফ্‌সোস! বড়লাট সাহেবের সংগে পরামর্শ করিতে-করিতে দেরি হইয়া গেল। আর একদিন আগে আসিতে পারিলে এই মহান জাতির অন্ততঃ দু'একজন লোককে বাঁচাইতে পারিতাম।

—তাঁহার চোখ হইতে দুই ফোঁটা পানি টস্ টস্ করিয়া পড়িয়া গেল।

আমি লাট সাহেবের এই অশ্রুপাতে কিছুমাত্র প্রভাবিত না হইয়া মাথা উঁচু করিয়া বলিলাম ঃ খোদাকে ধন্যবাদ. আপনি একদিন আগে আসেন নাই। আসিলে গোটা বাঙালি জাতি ধর্মের জন্য এমন করিয়া নিঃশেষ প্রাণদান করিতে পারিত না। আমাদের ধর্মে হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে আপনারা যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, খোদাই তাহা ব্যর্থ করিয়াছেন।

লাট সাহেব বলিলেন ঃ আমাদের প্রতি আপনি অবিচার করিতেছেন। অন্য সময় হইলে এই অপরাধে আপনাকে অন্তরীণে আবদ্ধ করিতাম। কিন্তু মহান বাঙালি জাতির আপনি একমাত্র জীবিত লোক বলিয়া আপনাকে রেহাই দিলাম। ধর্মপ্রাণ বাঙালি জাতির প্রতি আমরা কতটা শ্রদ্ধাবান তাহার প্রমাণ চান?

—বলিতে বলিতে তিনি অদূরে অবস্থিত স্বীয় এরোপ্লেনের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তাহা হইতে খুঁটিতে-বাঁধা একটি সাইনবোর্ড আনিয়া স্তূপাকার লাশের মধ্যে পুঁতিয়া দিলেন।

দেখিলাম ঃ সাইনবোর্ডে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—'ধর্ম'-রাজ্য'।

বুঝিলাম ঃ লাট সাহেব শুধু আমাদের ধর্মপ্রাণতায় শ্রদ্ধাবানই নন, ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাও বটে; তাই তিনি আগে হইতেই সব ঠিকঠাক করিয়াই আনিয়াছেন।

আমি লাট সাহেবের কাছে মাফ চাহিলাম এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম।

তিনি সিল্কের রুমালে চোখ, গাল এবং কপাল মুছিয়া গুড্‌বাই বলিয়া এরোপ্লেনে চড়িলেন এবং দিল্লী কিংবা বিলাত রওয়ানা হইলেন।

আমি নড়িতে পারিলাম না। লাট সাহেব আকাশে উড়িতে উড়িতে আমার দিকে রুমাল উড়াইতে লাগিলেন, একদৃষ্টে তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

লাট সাহেবের এরোপ্লেন অদৃশ্য হইলে সেই জনহীন দুর্গন্ধময় শ্মশানে লক্ষ-লক্ষ মৃতদেহের মাঝখানে আমি নিঃসঙ্গ বোধ করিলাম এবং ভয়ে মূর্ছিত হইয়া পড়িলাম।

কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম ঃ আসমান হইতে একজন ফেরেশ্‌তা একথাল মেওয়া লইয়া আসিয়া আমার শিহরে বসিলেন এবং আমার হাত ধরিয়া টানতে-টানতে বলিতে লাগিলেনঃ বেহেশ্‌তে সমস্ত শহীদানের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। তুমি খাইবে কখন? শিগ্‌গির উঠ।

ফেরেশ্‌তার টানাটানিতে আমি জাগিয়া উঠিলাম।

দেখিলাম, আমার রুম-মেট আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিতেছেন ঃ রাত নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, মেসের সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে তুমি খাইবে কখন? শিগ্‌গির উঠ।

====